সাহিত্য-সন্দর্শন

সাহিত্য-সন্দর্শন

শ্রীশচন্দ্র দাশ

অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাপ্তিস্থান—

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি অ্যাণ্ড কোং, লিঃ

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

১৯৪৭



মূল্য ৩৵৹ আনা মাত্র

প্রকাশক—

শ্রীসুধাংশুভূষণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-টি,

২৬-বি, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ— ১৯৪৭

প্রিণ্টার— শ্রীসুধীরবিহারী চক্রবর্ত্তী, বি. এ.

ভারতী মেশিন প্রেস, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ
আমার সাহিত্য-শিক্ষাগুরু খাঁ বাহাদুর
ডাঃ মাহ্মুদ হাসান, ডি-ফিল্ (অক্সন্)
মহাশয়ের করকমলে—



ভূমিকা

সাহিত্য-সন্দর্শনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সহৃদয় সাহিত্যানুরাগী, শিক্ষাব্রতী ও ছাত্রছাত্রীগণ ইহার প্রথম সংস্করণকে যে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই সংস্করণে আমি গ্রন্থখানা বিশেষ সতর্কতার সহিত স্থানে স্থানে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি এবং কতকগুলি নূতন বিষয় সংযোজিত করিয়াছি। ইহার সাহায্যে বাংলা সাহিত্য পঠন-পাঠন ও আলোচনার যথেষ্ট সহায় হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। বাংলা সাহিত্য বলিতে আমরা বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর গৌরবময় যুগের সাহিত্যের কথাই স্মরণ করিতেছি। এই সাহিত্য যে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজী সাহিত্য প্রভাবিত, এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্য আলোচনায় শুধু সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের প্রবর্তিত রীতিপদ্ধতির কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকিলে চলিবে না। বাংলা সাহিত্যবিচারের রীতিপদ্ধতি পাশ্চাত্ত্য অলঙ্কারশাস্ত্র হইতেই অনেকটা গ্রহণ করিয়া বাংলা সমালোচনাশাস্ত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেইজন্যই এই গ্রন্থে আমি যদিও প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য অলঙ্কার শাস্ত্রদ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছি, তথাপি অনেক জায়গায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নন্দন-তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সাহিত্যবিচারে নানা মত ও নানা পথ থাকিলেও আমি সর্ব্বকালের বিদগ্ধজনসম্মত সাহিত্যিক রুচিকেই সম্মুখে রাখিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। বিতর্কমূলক বিষয়ে আমি নিজস্ব মত দিতে গিয়াও যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করিয়াছি।

সম্প্রতি বাংলা দেশে বাংলা সাহিত্যের প্রতি সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হইয়াছে, এবং বাংলার দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়েই বাংলা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী ও বি. এ. অনার্স ক্লাশের পাঠ্য করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় বাংলা সাহিত্য আরও গভীরভাবে পঠনপাঠনের ও

আলোচনার সৌকর্য্যার্থেই এই গ্রন্থখানা রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, এই গ্রন্থ রচনাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বি. এ. অনার্স ও কলিকাতার এম্. এ. পরীক্ষার পাঠ্যভুক্ত *Principles of Criticism* সংক্রান্ত সিলেবাসের প্রতি আমি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি। ইহার দ্বারা ইংরেজী বিভাগের ছাত্রছাত্রীগণ মাতৃভাষার সাহায্যে সমালোচনা-শাস্ত্রের মূল কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁহাদের নিকট আমি ঋণী, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ইংরেজী সাহিত্য-সরস্বতী ও যাঁহাদের পদপ্রান্তে বসিয়া আমি যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পি-এইচ্-ডি, ও অধ্যাপক সুকুমার সেন, পি-এইচ্-ডি, সুধীরকুমার দাশ, পি-এইচ্-ডি, এবং শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পি-এইচ্-ডি, তাঁহাদের মূল্যবান মতামত জানাইয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমার পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান ভবতোষ দত্ত ও শ্রীমান অরবিন্দ বসু সাহিত্য-সন্দর্শন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। শ্রদ্ধেয় কবি-সমালোচক শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় প্রথম সংস্করণ সাহিত্য-সন্দর্শন আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আমার ঋণ অপরিশোধনীয়। ঢাকা ভারতী মেশিন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুধীরবিহারী চক্রবর্ত্তী, বি. এ. নিষ্ঠার সহিত গ্রন্থখানা ছাপাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে আমার অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৩

শ্রীশচন্দ্র দাশ



সূচীপত্র

সাহিত্য-সন্দর্শন



১

আর্ট

পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা সৌন্দর্য্যের যে লীলা নিরীক্ষণ করি, তাহা আর্ট নয়, প্রকৃতি। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দে সৌন্দর্য্যের অবিরাম স্রোত চলিয়াছে। বিশ্বের প্রথম মানব-সন্তান এই বিরাট সৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই অপরূপকে প্রেম-বিমুগ্ধ অন্তরে, বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং সেই অবধি কত প্রশ্ন তাহার মনে ভিড় করিয়া আসিতেছে। সে জানিতে চায়, বুঝিতে চায়, হইতে চায়। বিশ্বের সৌন্দর্য্যকে সে আপনার মধ্যে পাইতে চায়। এইজন্যই, সে বাতাসের মর্ম্মরধ্বনিকে, সাগরের কল্লোলকে, বিহঙ্গের কলরবকে, আকাশের নীলিমাকে নিজের মত করিয়া পাইতে চায়, রূপ দিতে চায়।

আর্ট ও প্রকৃতি—আর্ট কাহাকে বলে

কেন?—কারণ মানুষ একান্তভাবে অনুকরণ-প্রিয়। তাহার এই অনুকরণ প্রবৃত্তি হইতে আর্টের জন্ম। বাহিরের সৌন্দর্য্যকে সে নিজের করিতে চায—বিশ্বকে সে স্ব-এর মধ্যে বন্দী করিতে চায়। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, মানুষের অনুকবণ প্রবৃত্তি হইতে আর্টের জন্ম হইলেও Platoর মত আর্ট মাত্রই অনুকরণাত্মক বলা সঙ্গত হইবে না। কারণ মানুষ শুধু অনুকরণ করে না, অনুকৃত জিনিষকে সে যখন নিজের মনের মত কবিয়া স্বকীয় মানস-দৃষ্টির আলোতে মূর্ত্ত করে তখনই উহা আর্ট। Realকে, বাস্তবকে সে মানস-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া কায়াকান্তিময় করিতে চায়। তাই, আকাশের পরিব্যাপ্ত নীলিমা তাহার চিত্রপটে সুসীম হইয়া উঠে, সমুদ্রের অশান্ত কল্লোল তাহার তুলির লিখনে জীবন্ত হইয়া উঠে, ঝর্ণার 'রামধনু আঁকা' গতি-মূর্চ্ছনা তাহার কবিতায় বাঙ্ময় হইয়া উঠে, পাখীর কলকণ্ঠ তাহার সুর-যন্ত্রে বন্দী হইয়া উঠে। এই ভাবে বাহিরকে সে যেমন বন্দী করে, তেমনই আবার তাহার অন্তরকেও

সে বাহির করে। এই যে অন্তরকে বাহিব করিবাব (projection of self) ও বাহিরকে ভিতরের করিবাব কামনা, ইহাই আর্টের মূল কথা। যাহা অদৃশ্য ও অনধিগম্য, তাহাকে দৃশ্যমান ও অধিগম্য কবাই আর্টেব কাজ। আমাদের জীবন চঞ্চল— চঞ্চলতার স্রোতকে ক্ষণ-সৌন্দর্য্যের মধ্যে বন্দী করিয়া মুহূর্ত্তকে চিরত্ব দান করাই আর্টের ধর্ম্ম। জীবনে চলিষ্ণুতা আছে, আর্টে স্থিতি আছে। ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া জীবন অভাবনীয় পরিণতি লাভ করিতে পারে; কিন্তু আর্ট জীবনের ক্ষণ-সৌন্দর্য্যটিকে সমাহিত শান্ত-শ্রী দান করিয়া চিরদিনের কবিয়া বাখে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

সে নব জগতে কালস্রোত নাই, পরিবর্ত্তন নাহি

এইজন্যই Lessing বলেন—'It is to a single moment that the material limits of art confine its limitations'* সুতরাং আর্ট চলিষ্ণু জীবনের স্থিতিমান মুহূর্ত্তের প্রকাশ। এই জন্যই বিশ্বের চিরচঞ্চল প্রবাহ লক্ষ্য করিয়া রূপকার Goethe-এর ভাষায় বলিয়া ওঠেন—

Ah, still delay, thou art so fair!

অতএব আমরা বলিতে পারি যে, দৃশ্য বা অদৃশ্যকে শিল্পীর চিত্তরসে রসান্বিত করিয়া যে স্থিতিশীল রূপ-মহিমা দান করা হয়, উহাই আর্ট, বা কলাকীর্ত্তি এবং যিনি এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করেন তাঁহাকে আর্টিষ্ট ব শিল্পী বলা হয়। শিল্পী রূপ-বিলাসী, রূপকার। যে-সত্যকে তিনি অন্তরে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাকে অন্তরের বাহিরে তিনি স্থিতি বা সত্তা দান করেন। তাঁহার ব্যক্তি-অনুভূতি শুধু একান্ত ব্যক্তি-কথাই নয়। তিনি একদিকে যেমন বিশেষ, অপর দিকে আবাব নির্ব্বিশেষ। কারণ বিশেষ কোন শিল্পী আপনার মনের আলোতে কোন জিনিষকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে অপরের তথা সর্ব্বজনের মনের কথা বা ভাবময় রূপে প্রকাশ করেন। কাজেই বিশেষকে তিনি নির্ব্বিশেষ

* *Laokoon : Ch. IV.*

করিয়া, সর্ব্বজন-হৃদয়-বেদ্য করিয়া বস্তুরূপে মূর্ত্ত করিয়া তোলেন। তাঁহার মনের ধারাটী কোন একটী সূত্র বা চিহ্ন অবলম্বন করিয়া তখন রূপ পরিগ্রহ করে। 'সেই চিহ্নই কোথাও বা মূর্ত্তি, কোথাও বা মন্দির, কোথাও বা তীর্থ, কোথাও বা রাজধানী। সাহিত্যও এই চিহ্ন। বিশ্বজগতের যে কোনো ঘাটেই মানুষের হৃদয় আসিয়া ঠেকিতেছে, সেইখানেই সে ভাষা দিয়া একটা স্থায়ী তীর্থ বাঁধাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে—এমনি করিয়া বিশ্বতটের সকল স্থানকেই সে মানবযাত্রীর হৃদয়ের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য, উত্তরণযোগ্য করিয়া তুলিতেছে'।*

এইখানে আবার আর একটী প্রশ্ন আসিয়া পড়িতেছে। আর্টে শুধু নির্ব্বিশেষের ব্যঞ্জনা থাকিলেই চলিবে না, উহাকে নৈর্ব্যক্তিকও (impersonal) হইতে হইবে। নৈর্ব্যক্তিক অর্থ কি?—কোন শিল্পরূপ দেখিয়া যদি দ্রষ্টার মনে লোভ বা পাইবার বাসনা, কামনা উদ্রিক্ত হয়, তবে উহা নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টি নয়। উহাকে দেখিয়া উহার সৌন্দর্য্যবোধ ব্যতীত অন্য কোন ইচ্ছা তাহার মধ্যে প্রবল হইলে উহা আর্ট পদবাচ্য নয়। মনে করুন, আপনার সম্মুখে অতি সুন্দর একটী চিত্র আছে। ইহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া যদি আপনি ইহা পাইবার, অপহরণ করিবার অথবা আত্মসাৎ করিবার কামনায় প্রলুব্ধ হন, তবে উহার মধ্যে নৈর্ব্যক্তিকতা নাই বলিব। যদি মনে করেন, কত টাকা হইলে উহা আপনি ক্রয় করিতে পারেন, অথবা যদি মনে করেন কোন্ চিত্রকর ইহা কোন্ কোন্ রং মিশাইয়া তৈয়ার করিয়াছে, তবে বলিতেই হইবে আপনার কামনা ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইয়াছে; ইহাতে ঐ আর্টের আর্টত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কারণ আছে। আর যদি উহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনি আত্মবিস্মৃত হইয়া তন্ময়ভাবে কামনাহীনরূপে উহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উঠেন, তবে বলিব উহা সত্যকারের আর্ট।

ললিতকলা পাঁচটী, যথা—স্থপতিবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও কবিতা। প্রত্যেক শিল্পীই স্বকীয় অনুভূতি বা ভাবকল্পনাকে কখনো

* রবীন্দ্রনাথ: সাহিত্য

আর্টের বিশেষত্ব

স্থাপত্যশিল্পে, কখনো ভাস্কর্য্যে, কখনো চিত্রে, কখনো সঙ্গীতে, কখনো কাব্যে নিজের বাহিরে রূপ দান করেন। অর্থাৎ শিল্পী তাহার ভাবরাজ্যের স্বপ্ন কামনাকে বহির্জ্জগতে বস্তুরূপে প্রমূর্ত্ত করিয়া তোলেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ভাবকল্পনা বা অনুভূতির যথেচ্ছ প্রকাশে আর্টের সৃষ্টি হয় না। উহা শিল্পীর ব্যক্তিগত মানস-বিলাসের চিহ্ন মাত্র হইতে পারে। সত্যকারের শিল্প যে অনুপ্রেরণায় জন্মগ্রহণ করে, তাহার মধ্যে উদ্বেলতা থাকিলেও সংযমবোধ থাকা চাই। শিল্পী তাহার প্রেরণাকে সংযত ও সংহত করিয়া বিশেষ একটী রূপায়নের চেষ্টা করেন। সেইজন্য তাহার শিল্পের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটী ছন্দবোধ বা সৌষম্য বর্ত্তমান থাকে। এই সৌষম্য বা ছন্দবোধের সাহায্যে শিল্পটী প্রাণবান হইয়া উঠে; যেখানে ইহা হয় না, সেখানে শিল্পের অংশগত সৌন্দর্য্য থাকিলেও সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে কোন সৌন্দর্য্যবোধ উহাদ্বারা জাগ্রত হয় না। সুতরাং বিচিত্রতা যেমন সৌন্দর্য্যের উপাদান ও শিল্পের ভিত্তিভূমি, তেমনি একত্ববোধ উহার প্রাণ-নন্দিনী। খণ্ডাংশ যখন অখণ্ড মণ্ডলায়িত সৌন্দর্য্যসুষমা সৃষ্টি করে তখনই উহার মধ্যে প্রাণের শিহরণ ও দীপ্তির লাবণ্য বিচ্ছুরিত হয়— উহা সুষীম, সুন্দর, সঙ্গতিপূর্ণ রূপসৃষ্টি বা আর্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যে শিল্পী বাহিরের সহিত নিজের ও বিশ্বের সহিত আপনার পরিচয়কে নিবিড় করিয়া, অখণ্ড করিয়া অনুভব করেন নাই, তাহার শিল্পকর্ম্মে ছন্দঃপতনের লক্ষণ অনিবার্য্য। এখানে আর একটী মাত্র কথা বলা প্রয়োজন। শ্রেষ্ঠ আর্ট শুধু রূপসৌষম্য দ্বারা আমাদিগকে মুগ্ধ করে না, উহার মধ্যে রূপাতীতের ব্যঞ্জনা, 'a snatch beyond the reach of art' থাকে।

আর্ট ও বিজ্ঞানে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আর্ট অর্থ সৃষ্টি, রূপায়ন।

আর্ট ও বিজ্ঞান

রূপসৃষ্টির সহায়তার জন্য যে রীতিনীতি বা পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়, উহাই ইহার বিজ্ঞান বা শিল্প-রীতি। কবিতা লিখিবার সময় কবি নিজের

আর্ট

মনোগত ভাব প্রকাশার্থ যথাবিহিত শব্দ-চয়ন ও ছন্দ-রীতি সাহায্য গ্রহণ করেন। ইহাই কবিতা-শিল্পের বিজ্ঞান-ভূমি। চিত্রকর তুলির লিখনে দূরত্ব বা সন্নিকটত্ব বুঝাইবার জন্য যে নির্দ্দেশানুযায়ী রেখা সম্পাত করেন, উহাই চিত্রকলার বিজ্ঞান-ভূমি এবং চিত্রটী ললিতকলা। সুতরাং সৃষ্টি-নিয়ামক যে পদ্ধতি, তাহাকে বলিব বিজ্ঞান ও সৃষ্টিকে বলিব ললিতকলা, আর্ট। গভীর ভাবে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ; বিজ্ঞান ব্যতীত আর্ট রূপবান হইতে পারে না, আবার আর্টের সৃষ্টি ব্যতীত বিজ্ঞানেরও কোন সার্থকতা নাই।

আর্টের প্রকার ভেদ ও উদ্দেশ্য

আর্টের প্রধান উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। কিন্তু কয়েক প্রকার আর্টে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি গৌণ হইয়া মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধিই মুখ্য রূপে পরিগণিত হয়। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে উহাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহাদের মধ্যে কোন আন্তর সত্য নাই, ইহারা বহিরাবরণ ও বহিরাভরণের গুণেই সুপ্রতিষ্ঠ। গৃহ নির্ম্মাণ, মূর্ত্তি নির্ম্মাণ বা সুদৃশ্য অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ— প্রভৃতিকে আমরা এই শ্রেণীভুক্ত করিয়া 'কারুকলা' বা 'নির্ম্মাণ-কলা' (Mechanical Arts) নামে আখ্যাত করিতে পারি।

যে সৃষ্টির মধ্যে মানুষের সহেতুক বা প্রয়োজন সাধনের অপেক্ষা অহেতুক আনন্দ বেশি, যাহাতে মানুষের জৈব অপেক্ষা আত্মিক ও মানসিক আনন্দ সৃষ্টি বেশি, তাহাকে আমরা 'ললিতকলা' (Fine Arts) বলিয়া আখ্যাত করিতে পারি। অনেক সময় দেখা যায়, যাহাকে আমরা 'ললিতকলা' বলি, উহাও আর এক দিক হইতে দেখিলে 'কারুকলা' শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। স্থপতি বিদ্যা প্রসূত সুরম্য হর্ম্ম্যকে যখন মানব বাসোপযোগী করিয়া দেখি, তখন উহা কারুকলা, আবার উহাকে যখন সুবিহিত, সুষীম, রূপময় সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হিসাবে দেখি, তখনই উহা ললিতকলা। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা,

সঙ্গীত ও কাব্য এই পাঁচটীকে ললিতকলা শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে।*

রূপকারের (Artist) প্রধান অবলম্বন তাঁহার বিষয়বস্তু বা উপাদান (Matter)। কারণ বস্তুহীন রূপসজ্জা স্ব-বিরোধী কল্পনা। দার্শনিক হেগেলের মতে, যে ললিতকলায় যত বেশি বস্তু-প্রাধান্য এবং যাহা যত বেশি স্থূল-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা তত নিম্নস্তরের; যাহাতে বস্তু-অতিক্রমী মানস-স্পর্শ বেশি, তাহা তত উন্নত স্তরের ললিতকলা। এই হিসাবে **স্থপতি-বিদ্যা** (Architecture) সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর ললিতকলা বলিয়া পরিগণিত। কারণ, এইখানে বস্তু সত্তার ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতার প্রাধান্য বেশি। প্রস্তরের সুবিহিত বিন্যাসে যে তাজমহল—

এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল

—রূপে উদ্ভাসিত, উহা দ্রষ্টার নিকট দৈর্ঘ্য বিস্তার ও বেধ সমন্বিত বস্তুরূপেই প্রতীয়মান হয়। **ভাস্কর্য্য** (Sculpture) ইহা অপেক্ষা উন্নত স্তরের। পাথর বা ধাতব পদার্থের বুক কাটিয়া শিল্পী সেই উপকরণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীগত ও গুণগত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন। ভাস্করের রূপ-সৃষ্টিতেও বস্তুসত্তা আছে সত্য, কিন্তু বস্তুপিণ্ডকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ভাস্কর উহাকে যতখানি প্রাণময় ও জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারেন, স্থপতি-বিদ্যার পক্ষে ততখানি সম্ভব নয়।

চিত্রশিল্পী দৈর্ঘ্য-বিস্তার-সম্বলিত পটভূমিকায় তুলির লিখনে ও রং এর খেলায় বস্তুসত্তার আয়তন, এমন কি দূরত্ব বা নৈকট্য-বোধ, দ্রষ্টার মনে জাগাইয়া তোলেন। কিন্তু এই স্থলেও সেই বস্তুসত্তা, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য অপেক্ষা গভীরতর ভাবে, শিল্পীর কল্পনা-রসে রসায়িত হয়। কারণ, শিল্পী ঐতিহাসিক বা প্রাকৃতিক কোন আলেখ্য অঙ্কনেও বস্তু সত্তাকে তাঁহার আত্মগত অনুভূতি-রঞ্জিত করিয়া দ্রষ্টার গোচর

* এতদ্ব্যতীত নাটক, বাগ্মিতা ও নৃত্যবিদ্যাকে মিশ্র-ললিতকলা রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

করেন। সঙ্গীতজ্ঞও তাললয় সমন্বিত সুর ও কথার সাহায্যে কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করেন।* কথাও কাব্যের বাহন, সুতরাং সঙ্গীতজ্ঞও কাব্যের আশ্রয় গ্রহণ কবিতে বাধ্য হন। শব্দাতীত সুরে অস্পষ্ট মাধুর্য্য থাকিলেও উহাতে রূপ-সৃষ্টির ক্ষমতা নাই। এই জন্যই শুধু সুরের সাহায্যে শিল্পীর মনের রূপসৃষ্টি-কামনা সার্থক হইতে পারে না। একমাত্র কবিই শব্দের সাহায্যে আমাদেব কাছে সঙ্গীত মূর্চ্ছনা ও চিত্রাত্মক ভাব কল্পনাব রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তোলেন। কবিতা শব্দ-ব্যঞ্জনায়, ইঙ্গিতে, ভাবে, সঙ্গীত-মাধুর্য্যে শব্দাতীতকে আমাদের গোচর করে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে নম্র-নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চলো সলজ্জিত বাসর-সজ্জাতে
স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে।

—তখন উর্ব্বশীকে ছাপাইয়া আমাদের কাছে শয্যাসঙ্গিনী লজ্জারুণা নারী প্রতিমা রূপময়ী হইয়া ওঠে—তাহার গতিতে জড়িমা, দৃষ্টিতে ব্রীড, হাস্যে অনির্ব্বচনীয়তা। এইজন্যই কাব্য শ্রেষ্ঠ ললিতকলা বলিয়া পরিগণিত। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে, মানুষ একই সৌন্দর্য্যবোধেব তাড়নায় আপন আপন ধবনে বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে বিভিন্ন ললিতকলা সৃষ্টি করিয়াছে। এই হিসাবে কেহ হয় তো কাহাবও কাছে ছোট নয়। ভাস্কর রোদাঁ, সঙ্গীতজ্ঞ বীটোফেন্ চিত্রকর লেওনার্দো দা ভিঞ্চি বা অবনীন্দ্রনাথ এবং সেক্সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথ—প্রত্যেকেই আমাদেব সমানভাবে বরণীয়। কিন্তু শিল্পীর উপকরণ ও পদ্ধতি বা রূপ-বন্ধের (Method) বিভিন্নতাব কথা ছাড়িয়া দিলে, রূপ-সৃষ্টিব মধ্যে শিল্পীর অন্তরের অভিব্যক্তি কতটুকু হইয়াছে এবং উহা সহৃদয় জনেব হৃদয় কতখানি অধিকার করিতে পারিয়াছে, ইহাদ্বারাই তাঁহার

* সঙ্গীত যেখানে কথা ছাড়াইয়া শুধু সুরের মূর্চ্ছনায় উপনীত, সেখানে সে আর্টকে অতিক্রম করিয়া যায়; কারণ সঙ্গীত তখন আর রূপাত্মক নহে, ভাবাত্মক মাত্র। এই ক্ষেত্রে সঙ্গীতের বস্তুসত্তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইলেও উহাকে আর্ট বলা যায় কিনা সন্দেহ।

সৃষ্টির মূল্য নির্ণীত হয়। সত্যকথা বলিতে কি, কাব্যের মধ্যে কবির অন্তর-চেতনা যতখানি পরিস্ফুট হয় এবং যত গভীর ভাবে উহাতে সহৃদয় জনের হৃদয় আকৃষ্ট হয়, অন্য কোন ললিতকলাতেই ততখানি হয় না। কারণ, কবি বাস্তব জগতের বস্তু-সত্তাকে নিজের চিত্তরসে অভিষিক্ত করিয়া সর্ব্বজন-হৃদয়-বেদ্য ভাবময় রূপে সমর্পণ করেন এবং শব্দের সাহায্যে শব্দাতীত মানস-বস্তুকে আমাদের নিকট নিবেদন করেন।

শুধু ইহাই নয়, অন্যান্য ললিতকলার ধরনধারণ ও অভিব্যঞ্জনা পর্য্যন্ত কাব্যে প্রতিফলিত হইতে পারে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের স্থির অচঞ্চল রূপ-গরিমা ক্ল্যাসিকেল সাহিত্যে— মিল্টন্ ও মধুসূদনে মর্ম্মর-শিল্পের রূপ লাভ করিয়াছে; চিত্রাত্মক সৌন্দর্য্য রোমান্টিক সাহিত্যে ও কালিদাসে প্রচুর রহিয়াছে; সঙ্গীতের দেহহীন লাবণ্য বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, শেলী, সুইন্‌বার্ণ ও রবীন্দ্রনাথে ছন্দোময় হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যও কাব্যকে আমরা শিল্প-শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি।

২

সাহিত্য

মানুষ এই পৃথিবীতে নিজেকে যতই স্বাধীন বলিয়া মনে করুক, সে কখনো একান্তভাবে স্বাধীন নহে। একদিকে সে যেমন ব্যক্তি-বিশেষ, অপর দিকে আবার তাহার জাতির ভাব-কল্পনা ও ঐতিহ্যের প্রতিনিধি এবং সমাজের অঙ্গ বিশেষ। এই হিসাবে তাহার মধ্যে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চিহ্ন রহিয়াছে। আবার, মানুষের মধ্যে পশু-প্রবৃত্তি অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি ব্যতীত বিচারবুদ্ধি এবং অনুভূতিও রহিয়াছে। শেষোক্ত দুইটাই তাহাকে মানবেতর সৃষ্টি হইতে বিলক্ষণ করিয়া সৃষ্টির মধ্যে মহৎ মর্য্যাদা দান করিয়াছে।

সাহিত্য-সৃষ্টি

মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। সে নিজেকে বাহিরে দেখিতে চায়— মানুষের মধ্যে, অপরের মধ্যে সে আপনাকে পাইতে চায়; এবং পাইতে চায় বলিয়া সে-ও ভগবানের মত নিজেকেই প্রকাশ করিতে চায়। ভগবান যেমন 'বহুস্যাম'—বহু হইব, বলিয়া সৃষ্টির আনন্দে জগৎ সৃষ্টি করেন, মানুষও তেমন নিজের ভাব-কল্পনাকে বহু রূপ পরিগ্রহ করাইয়া তাহার মাধুর্য্য উপভোগ করিতে চায়। এই ভাবে আত্ম-প্রকাশের জন্য মানুষের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষ যেহেতু কেবল আপনাকে লইয়া বিব্রত নহে, সেই জন্য তাহার পারিপার্শ্বিক, তাহার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, তাহার দেশ জাতি ও প্রকৃতিকে সে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। ইহারা তাহার বাস্তব পারিপার্শ্বিক। এতদ্ব্যতীত, মাটীর মানুষ ক্ষুধাতৃষ্ণার দাবী মিটাইয়া আর একটী কাল্পনিক জগতের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। বাস্তব-জীবন ব্যতীত আর একটী কল্প-জগতের মোহ তাহাকে পাইয়া বসে। কারণ, বাস্তব জগতে তাঁহার

২—

সকল আশা আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। তাই কল্পনার জগতে সে জীবনের অপূর্ণতার বৃত্তাংশকে পরিপূর্ণ করিয়া পায়— তাহার অপ্রাপ্তির ইতিহাস কল্পনার জগতে প্রমূর্ত হইয়া উঠে এবং সাহিত্যে উহা তাহার স্বপ্ন-পূরণ রূপে দেখা দেয়। আবার ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মানুষ স্বভাবতঃই রূপ-বিলাসী, স্রষ্টা। এই জন্য স্বকীয় ভাবনা-কামনাকে রূপাশ্রয়ী করিবার ইচ্ছা তাহার সহজাত বৃত্তি। সুতরাং আত্ম-প্রকাশের কামনা, পারিপার্শ্বিকের সহিত সংযোগ কামনা, কল্প-জগতের প্রয়োজনীয়তা এবং রূপ-প্রিয়তা— এই চারিটীই মোটামুটি হিসাবে মানুষের সাহিত্য-সৃষ্টির মূল উৎস। কিন্তু আত্ম-প্রকাশ কথাটীই যে মুখ্য, ইহা বলাই বাহুল্য।

সাহিত্যিক যখন আত্ম-প্রকাশ করেন, তখন তিনি হয়তো নিজের অন্তর পুরুষকে প্রকাশ করেন বা বাহ্য জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দকে আত্মগত অনুভূতি-রসে স্নিগ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন, অথবা তাঁহার ব্যক্তি-অনুভূতি-নিরপেক্ষ বিশ্ব-জগতের বস্তু-সত্তাকে প্রকাশ করেন। নিজের কথা, পরের কথা বা বাহ্য-জগতের কথা সাহিত্যিকের মনোবীণায় যে সুরে ঝঙ্কৃত হয়, তাহার শিল্প-সঙ্গত প্রকাশই **সাহিত্য**।

সাহিত্য লেখকের আত্ম-প্রকাশ

'প্রকাশ' বলিলেই আমরা যিনি প্রকাশ করেন এবং যাহা প্রকাশ করেন, এই দুইটী সম্বন্ধে সচেতন হই। যিনি প্রকাশ করেন, তিনিই সাহিত্যিক এবং যাহা প্রকাশ করেন, তাহাই সাহিত্যের বস্তু ব সামগ্রী। প্রকাশের একটী বিশিষ্ট ভঙ্গি থাকা চাই। ইহার উপর নির্ভর করিয়াই সাহিত্যের রূপ-ভেদ নির্দ্ধারিত হয়। যখন সাহিত্যিক একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করেন, তখন উহাকে আমরা মন্ময় সাহিত্য বা *Subjective Literature* বলি। সাহিত্যে বস্তু-সত্তার প্রাধান্য হইলে উহাকে তন্ময় সাহিত্য বা *Objective Literature* বলা হয়। এই স্থলেও একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, নিছক বস্তুতন্ত্র সাহিত্য (*Realistic Literature*) ব্যতীত সকল সাহিত্যই কম বেশী ব্যক্তি-

অনুভূতি-রঞ্জিত। প্রকাশ-ভঙ্গিতে কখনো সাহিত্যিকের বুদ্ধিবৃত্তি, কখনো অনুভূতি, কখনো কল্পনা বা কখনো বাণী-বিন্যাসের কলা-কৌশল মুখ্য হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সু-সাহিত্যে ইহাদের সমন্বয় সাধিত হইয়া থাকে ; এবং তখনই ভাব, ভাষা, বাচ্যার্থ, ব্যঙ্গ্যার্থ, রীতি প্রভৃতির সঙ্গতি সংসাধিত হয়।

সাহিত্যে লেখক, বস্তু-জগৎ ও প্রকাশ-ভঙ্গি

সাহিত্য বলিতে সাহিত্যিকের মন, বস্তু-জগৎ ও প্রকাশ-ভঙ্গি— এই তিনটী বিষয়ই লক্ষ্য করিবার বিষয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাহিত্যিক নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করেন। কিন্তু সর্ব্বথা আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসই সাহিত্য নয়। সাহিত্যিক বাহিরের জিনিষকে 'আপন মনের মাধুরী' মিশাইয়া রচনা করেন। কেন ?— আত্ম-প্রকাশের জন্য। কিন্তু আত্ম-প্রকাশই সব কথা নয়। আত্ম-প্রকাশ করেন, আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য, আত্ম-বিস্তারের জন্য, নিজেকে পাঠক সম্প্রদায়ের গোচর করিবার জন্য। সর্ব্বকালের সহৃদয়জনের হৃদয়-বেদ্য ভাবকে আত্মগত করিয়া আবার তাহাকে পরের করিয়া প্রকাশই সাহিত্য। এইজন্য সাহিত্য একান্ত ব্যক্তি-নিষ্ঠ হইয়াও ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষ।

ইহার পর বস্তু-জগৎ। বস্তু-জগৎ বলিতে আমরা কী বুঝি ? সাহিত্যিকের একান্ত ব্যক্তি-চরিত্র বা ব্যক্তি-চিত্ত ব্যতীত তাঁহার চারিদিকে দৃশ্য ও অদৃশ্য যে-জগৎ লীলা-চঞ্চল রূপে বর্ত্তমান, উহাই বস্তু-জগৎ। এই জন্যই বিশ্ব-প্রকৃতি, জীব-প্রকৃতি ও অদৃশ্য যে-শক্তি মানুষের সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষভাবে ক্রীড়া করিতেছে তাহাও সাহিত্যের সামগ্রী। মোটকথা, বিশ্ব-প্রকৃতি, ভগবান, মানব ও জীব-জগৎ— সকলই সাহিত্যের সামগ্রী। এই সামগ্রী যখন সাহিত্যিকের কল্পনা-রঞ্জিত হইয়া আত্ম-প্রকাশ করে— ভাবে নয়, ভাবময় রূপে, তখনই উহা সাহিত্য।

'ভাবময় রূপে' বলিবার সার্থকতা এই যে, সাহিত্য কখনও নিছক

ভাবময় নয়; ভাবকে রূপে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। এই চোখে-দেখা কানে-শোনা বস্তু-উপাদানকে সাহিত্যিক গ্রহণ ও বর্জ্জনের দ্বারা শোধন করিয়া প্রকাশ করেন। বিষয়বস্তু ও প্রকাশ-ভঙ্গি যদিও পরস্পর সাপেক্ষ, তথাপি বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্যে প্রকাশ-ভঙ্গির মূল্য বেশি। একই বিষয়বস্তু লইয়া দুইজন কবি দুইটী কবিতা লিখিতে পারেন, এবং উভয় কবিতা সুন্দর নাও হইতে পারে। দেখিতে হইবে, বিষয়বস্তু কবি-কল্পনায় সর্ব্বমানবের পক্ষে কতখানি হৃদয়গ্রাহী ও সুন্দর রূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। মনে করুন, খবরের কাগজে আপনি একটী সংবাদ পাইলেন, কোথাও কোন স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহ করিয়া হত্যা করিয়াছে। এই লোমহর্ষণ কাহিনী পড়িয়া মানব-চরিত্রের অভাবনীয় বিকারে আপনি ব্যথিত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যিক যখন এই কাহিনীকে নির্ম্মন্থন করিয়া Othello-নাটক রচনা করেন, তখন Desdemona-কেও আপনার খারাপ লাগে না, এমন কি, বেচারা স্বামী Othello-কে পর্য্যন্ত আপনি সহানুভূতি না দেখাইয়া পারেন না। আপনি বোঝেন, স্ত্রী-হত্যা করিয়া সে ভাল করে নাই। কিন্তু এমতাবস্থায় হত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায়ও যে ছিল না, এই বোধই আপনার প্রাণে সঞ্চারিত হয়। তখন আপনি সহানুভূতিশীল হইয়া উভয়কে গ্রহণ করেন এবং বেদনার মধ্যেও আপনার মনে অপূর্ব্ব আনন্দ সঞ্চারিত হয়। এই ভাবেই কল্পনার সাহায্যে ব্যবহারিক জীবনের সত্যকে (Fact) সাহিত্যিক কাব্যের সত্যে (Truth) পরিণত করেন।

সাহিত্যিক বা কাব্যগত সত্য

এখন কথা হইল, সাহিত্য যদি বাস্তব-সত্যকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়, তবে কি সত্য হইতে বিচ্যুত হয়? অনেকে মনে করেন, সাহিত্য প্রকৃতির অনুকৃতি (Imitation); কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। প্রকৃতিতে যাহা আছে, সাহিত্যে তাহাই পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত, বিশেষিত (Particularised) ও সুন্দর হইয়া ওঠে। মনে করুন, কোন কবি বা সাহিত্যিক

সিঞ্চলে সূর্য্যোদয়েব দৃশ্যে আলোকেব জন্ম-মুহূর্ত্তে অন্ধকারের যে বেদনা কম্প আছে, তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি যখন তাহাকে সাহিত্যে রূপ দান করিতে চাহেন, তখন তাঁহার সূর্য্যোদয়-দৃশ্য-দর্শনেব অভিজ্ঞতাব মুহূর্ত্ত ও তৎকালীন আনন্দ অনুভূতিব কথা তাঁহাব মানব অব চতন অংশে আত্ম-গোপন করিয়া আছে। সেই স্থান হইতে তাহাবা নবদেহ পরিগ্রহ করিয়া, নব অঙ্গরাগে রঙিন হইয়া কবির বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষীভূত হয়। কবি যেন বর্ণনা-প্রসঙ্গে প্রথম অভিজ্ঞতাব বস্তু-সত্তা হইতে অনেক দূরে সরিয়া আসেন, এবং যে বং ও রেখায় তিনি উহাকে এখন চিত্রিত করিতেছেন তাহাব সৌষম্য রক্ষা করাই তাঁহার পক্ষে তখন মুখ্য বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য, ইতিপূর্ব্বে কবি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা নয়, কবিব আলেখ্য-বর্ণনা যতটুকু সম্পন্ন হইয়াছে, ত হার সহিত সঙ্গতি রক্ষাব প্রেরণাই তাঁহাকে পরিচালিত করে। সুতরাং পরিণামে যাহা রূপময় হইয়া উঠে, তাহা কবিব প্রথম অভিজ্ঞতা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ— তাহা শুধুই প্রকাশ নয়, রূপান্তরিত রূপে (transformed), অভিনব রূপে, নবজন্ম-প্রাপ্ত রূপে প্রকাশ। এইখানে সাহিত্যিক বা কাব্য সত্য এবং ঐতিহাসিক সত্যের কথা আসে। ইতিহ স বা ভূগোলে যে সত্য, তাহা তথ্য-সত্য (*Truth of Fact*)। এই সত্য সম্বন্ধে কখনো দ্বি-মত হয় না। হিমালয ভারতের উত্তরে অবস্থিত, এই ভৌগোলিক সত্য সম্বন্ধে কেহ কোনদিন দ্বি-মত পোষণ করেন না। শাজাহান যে সকল অনুষ্ঠানেব দ্বারা মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন তাহা শুধু ঐতিহাসিক তথ্য। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও সত্য তাঁহার মহত্ত্ব। সেই সত্যটী— তথ্যটী নয়, পাঠকেব মনে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে ঐতিহাসিকেব গবেষণা অপেক্ষা কবি-প্রতিভাব আবশ্যকতা বেশি। এই কবি-প্রতিভা যে সত্য প্রতিষ্ঠা করে, তাহার বস্তুগত সত্যতা নাই, সম্ভাব্য সত্যতা (*Truth of Probability*) আছে। যাহা হইতে পারে কবি বা সাহিত্যিক তাহাকে সত্য বলিয়া অন্তর হইতে উপলব্ধি করেন। যে ভাবে কবি বিষয় সন্নিবেশ ও চরিত্রাঙ্কন করেন

তাহার সম্ভাব্য-সত্যতা প্রদর্শনই তাঁহার অভিপ্রায়। বাণীকৃত তথ্য হইতে কবি কল্পনার সাহায্যে সত্যতম, নিত্যতম সত্যকে আবিষ্কার করেন— এই আবিষ্ক্রিয়া ঐতিহাসিকের নয়, সত্য-দ্রষ্টা কবি-প্রতিভার। এই জন্য কাব্য বা সাহিত্য পাঠ করিতে আমরা বর্ণিত ঘটনাবলীর যথাযথ সত্যতার জন্য উৎসুক হই না। 'পল্লীসমাজ' পড়িয়া কূয়াপুকুর নামক কোন গ্রামে রমা বা রমেশের জীবন সত্যই বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী প্রভৃতির জন্য ব্যর্থ হইয়াছিল কিনা ইহাও আমাদের জিজ্ঞাস্য নয়। বাংলার পল্লীসমাজের তেমন আবহাওয়ায় তেমন একটী মর্ম্মান্তিক কাহিনী সম্ভবপর হইতে পারে, এবং রমা ও রমেশ যেরূপ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও স্বতন্ত্র পরিবেশে বর্দ্ধিত, তাহাতে তেমন পরিণতি অত্যন্ত স্বাভাবিক, এই বার্ত্তা যদি শরৎচন্দ্র আমাদের হৃদয়ের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া থাকিতে পারেন, তবেই উপন্যাসের কাব্যগত সত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে বলিয়া আমরা উপলব্ধি করি। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেন—

ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি,
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

বহুদিন পূর্ব্বে Aristotle এই কথাই বলিয়াছিলেন— 'The truth of poetry is not a copy of reality but a higher reality *what to be*, not *what is*. ...Probable impossibilities are to be preferred to improbable possibilities.' *

সাহিত্যকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা— জ্ঞানের সাহিত্য এবং ভাবের সাহিত্য। জ্ঞানের সাহিত্যের মধ্যে বস্তু-সত্তা ব্যক্তি-অনুভূতি দ্বারা ততখানি রঞ্জিত হয় না। জগদীশ বসুর 'অব্যক্ত', জগদানন্দের 'আলো' বা রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব-পরিচয়'— ইহাদিগকে 'জ্ঞানের সাহিত্য' বলিতে পারি। যে সাহিত্যে বিষয়বস্তু লেখকের স্বকীয় ভাব-কল্পনা বা ব্যক্তি অনুভূতি দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশ পায় তাহাকে ভাবের সাহিত্য

জ্ঞানের সাহিত্য ও ভাবের সাহিত্য

* Aristotle Poetics (Butcher's Translation)

বলা যায়। উপন্যাস, গল্প নাটক, কবিতা— ইহাদিগকে 'ভাবের সাহিত্য' বলিতে পারি। বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, জ্ঞানের সাহিত্য বিশুদ্ধ সাহিত্য পদবাচ্য নয়। কারণ, ইহার মধ্যে ব্যক্তি-স্পর্শ নাই, ইহার সর্ব্বজন-প্রিয়তার মূলে বুদ্ধিবৃত্তি, ব্যক্তি-হৃদয় নয়। যুগে যুগে জ্ঞানের সাহিত্য পরিবর্দ্ধিত ও উন্নত হইতে পারে। আজ বিজ্ঞান-জগৎ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিত হইল, দশ বৎসর পর আর একটী অনুরূপ গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, আজিকার সাহিত্য মূল্যহীন হইবে। কারণ, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বে প্রকাশিত গ্রন্থখানার মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভাবের সাহিত্যের উন্নততর সংস্করণ হইতে পারে না। এই জন্যই 'বিশ্ব-পরিচয়' অপেক্ষা উন্নততর জ্ঞানের সাহিত্য রচিত হইতে পারে, এবং হইলেই ইহার মূল্য থাকিবে না। কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্য' বা 'সোনার তরী' কাব্যের উন্নত বা পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ হয় না, হইতে পারে না। ইহারা চিরকালের সাহিত্য। এই খানেই ভাবের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব। জ্ঞানের সাহিত্য যুগের কথা প্রকাশ করে, ভাবের সাহিত্য যুগন্ধর হইয়াও যুগাতীতকে প্রকাশ করে। প্রথমটী মানুষের বুদ্ধিকে জাগ্রত করে, দ্বিতীয়টী তাহার হৃদয়কে অধিকার করে। প্রথমটী সাময়িক, দ্বিতীয়টী চিরকালের।

সাহিত্যে সর্ব্বজনীনতা

প্রশ্ন হইতে পারে, সর্ব্বমানবকে জানা কি সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব? সম্ভব নয়— আবার সম্ভবও। সর্ব্বমানবকে এক এক করিয়া জানা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সাহিত্যিক যদি নিজেকে জানেন, তবে তাঁহার আত্ম-জ্ঞানের মধ্য দিয়াই সর্ব্বজনপরিচিতি সম্ভব হইবে। এই জন্য বলা হয়, একান্ত ব্যক্তি-গত সাহিত্যই একান্তভাবে সর্ব্বজনীন (universal)। কথা এই যে, যে সাহিত্যিকের অনুভূতিতে আন্তরিকতা আছে, যাহার আত্ম-বোধে ফাঁকি নাই, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়। মনে করুন, আপনাকে একটী গরু আঁকিতে বলা হইল। আপনি হয়তো পারিতেছেন না। কেন?— আমি বলি, আপনি অনেক গরু দেখিয়াছেন সত্য,

কিন্তু একটী গরুও ভাল করিয়া, সত্য কবিয়া দেখেন নাই; দেখিলে আঁকিতে পাবিতেন; এবং একটী গরু আঁকিতে পারিলেই যাবতীয় গরু সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান বা সত্য-দৃষ্টি সম্বন্ধে কাহাবও সন্দেহ থাকিবে না। একটী সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান নাই, তাই বহুকে আপনি উপলব্ধি করিতে পাবেন না। সুতরাং দেখা যায় যে, একটী সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান-দৃষ্টি থাকিলে একের মধ্য দিয়াই বহুর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। একান্ত ব্যক্তি-নিষ্ঠ সাহিত্যিকের হৃদয়-বাণীও তখন ব্যক্তি-কথা না হইয়া বিশ্বের সকলের কথা হইয়া দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ যখন মিলন-পিপাসু প্রেমিকের অন্তর-বাণীকে ভাষা দেন—

এমন্ দিনে তারে বলা যায়,
এমন্ ঘন ঘোর বরিষায়!
এমন্ মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়!

*   *   *

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

—তখন উহার মধ্যে নিখিল-হৃদয় আত্ম-দর্শন করিযা মুগ্ধ হয। সুতরাং বলা যাইতে পাবে, ব্যক্তি-বিশেষে যাহাব আবম্ভ, ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে তাহার পরিণতি। এই নির্ব্বিশেষ ভাব (Universal Element) না থাকিলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্ট হয় না। যে সাহিত্যিক নিজের অনুভূতি-সলিলে নিজে মগ্ন হইয়া আত্ম-বিস্মৃত হইতে পারেন না, তিনি সত্যকাব সাহিত্যিক নহেন, কারণ ব্যক্তিত্ব-বিলাসই তাঁহাব পক্ষে মুখ্য বস্তু।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেব রূপ-সৃষ্টির পশ্চাতে 'mighty sense of experience' থাকে। এই অভিজ্ঞতাকে বিশোধন করিযা তিনি সমগ্র

জীবনের আলেখ্য তাঁহার কাব্যে চিত্রিত করেন। সমগ্রতার চিত্র যাহার কাব্যে নাই, তাহার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিও অসার্থক, ব্যাহত, অপরিপুষ্ট ও বিকলাঙ্গ। অবশ্য, সমগ্রকে দেখিতে হইলে সাহিত্যিকের দৃষ্টির প্রসার ও আত্মস্থতা থাকা বাঞ্ছনীয়। একটী উদাহরণ দিতেছি। মনে করুন, পথ চলিতে অন্ধকারে সহসা আপনি একটী ভীষণদর্শন ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইয়াছেন। আপনি ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিলে যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কী দেখিয়াছেন, তখন আপনি ভীত-কম্পিত স্বরে উত্তর দেন, একটা ভীষণ—প্র-কা-ণ্ড বাঘ—ভয়ঙ্কর। ইহা অপেক্ষা বেশি কিছু বলা আপনার পক্ষে সম্ভবপর নয়, কারণ আত্মরক্ষার জন্য আপনি এত ভয়ার্ত্ত ছিলেন যে, বাঘটীকে সমগ্রতায় দেখিতে পারেন নাই। কাজেই আপনার রূপ-বর্ণনার মধ্যে অখণ্ড সৌন্দর্য্য-বোধ নাই। কিন্তু এই বাঘটীকেই যদি আপনি পশুশালায় সুরক্ষিত অবস্থায় দেখেন, তবে আপনি তাহার অনতিদূরে দাঁড়াইয়া তাহার দেহের বর্ণ বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ নির্ভয়ে নিরীক্ষণ করিতে পারেন। কেন?— যেহেতু, আপনি এখন আত্মরক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত। সুতরাং বাঘটীকে এখন আপনি সমগ্রভাবে দেখিতেও পারেন, এবং ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ বর্ণনাও করিতে পারেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক যখন আত্ম-নিরপেক্ষ হইতে পারেন, তখনই তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে জীবন ও জগতের সমগ্র রূপ প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

সাহিত্যিকের অখণ্ড দৃষ্টি

সাহিত্যকে যাহারা অবসরবিনোদনের উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা মনে করেন, ইহা Escapism বা পলায়ন-মনোবিলাসের অবলম্বন মাত্র। তাহারা একটু গভীর করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, নিছক পলায়নী মনোবৃত্তি পরিপোষক সাহিত্যেও Escape *from* life-এর সুরের সঙ্গে Escape *into* life-এর সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা আছে। কারণ, এই ধরণের সাহিত্যিকও নিজেকে দূর-সংস্থিত করিয়াই, জীবনের জটিলতা

সাহিত্যের উদ্দেশ্য

৩—

হইতে দূরে গিয়াই, জীবনকে দেখিবার চেষ্টা কবেন। এই দেখাটিও কম দেখা নয়। সাহিত্যিক রচনা হইতে বিভিন্ন মনোবৃত্তি, শিক্ষা, দীক্ষা, পারিপার্শ্বিক ও সংস্কৃতি প্রভাবিত জনগণ বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করুক, ইহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ থাকিতে পাবে না। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোন শিক্ষাদান বা মতবাদ প্রচার কবা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। যে সাহিত্যে মতবাদ প্রচার উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বসসৃষ্টি বা শিল্পকর্ম্ম হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে। সাহিত্যের আসল উদ্দেশ্য জীবন ও জগতের বিচিত্র আনন্দময় রূপসৃষ্টি। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য শিক্ষাদান ব্যাপারটী গৌণ রাখিয়া সাহিত্য-সৌন্দর্য্যকেই বড কবিয়া দেখায়।

৩

কবিতা

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, আদি কবি বাল্মীকির ক্রৌঞ্চমিথুন বিয়োগ-জনিত শোকই শ্লোক রূপে উৎসাবিত হইয়াছিল। সহচরী-বিয়োগ-কাতর ক্রৌঞ্চের বেদনায় কবির চিত্তে বেদনাব সঞ্চার হয়। এই বেদনা হইতেই সহসা 'পবিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত' জন্মগ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব ছন্দে কবি-কণ্ঠে উচ্চাবিত হইল—

কবি ও কবিতার জন্ম

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

কবির এই বেদনা-বোধ স্বকীয় দুঃখ-সন্তপ্ত চিত্তের অবস্থা নহে ; ইহাব মধ্যে তদ্গত চিত্তের আত্ম-প্রকাশের আনন্দ-বেদনা আছে। এই—

… … … অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তা'র বক্ষে বেদনা অপার,
তা'র নিত্য জাগরণ ; অগ্নিসম দেবতার দান
উর্দ্ধশিখা জ্বালি' চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, কবির বেদনা-বিদ্ধ হৃদয়ই কবিতাব জন্ম-ভূমি। অর্থাৎ, সময়-বিশেষে কোন একটী বিশেষ সূত্রকে অবলম্বন করিয়া কবির আনন্দ-বেদনা যখন প্রকাশের পথ পায়, তখনই

কবিতার জন্ম। কবি বেদনাকে আস্বাদ্যমান রস-মূর্ত্তি দান করেন। ব্যক্তিগত বেদনার বিষপুষ্প হইতে কবি যখন কল্পনার সাহায্যে আনন্দমধু আস্বাদন করিতে পারেন, তখন বেদনা পর্য্যন্ত রূপান্তরিত ও সুন্দর হইয়া উঠে। বেদনার যিনি ভোক্তা, তাঁহাকে উহার দ্রষ্টা না হইতে পারিলে তাহা দ্বারা কাব্য-সৃষ্টি সম্ভব নয়। কবির বেদনা-অনুভূতির এই রূপান্তর-ক্রিয়া সম্বন্ধে ক্রোচে বলেন—

Poetic idealisation is not a frivolous embellishment, but a profound penetration in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation.

আসল কথা এই যে, বাহিরের জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ বা আপন মনের ভাবনা-বেদনা-কল্পনাকে যে-লেখক অনুভূতি-রঞ্জিত ছন্দোবদ্ধ তনু-শ্রী দান করিতে পারেন, তাহাকেই আমরা কবি নামে বিশেষিত করি।

অনেকে বলেন যে, যিনি জগতের একখানি যথাযথ স্বাভাবিক চিত্রপট আঁকিয়া দিতে পারেন, তিনিই যথার্থ কবি। অর্থাৎ কবি জগতের ভালো-মন্দের যথাযথ চিত্র অঙ্কন করিবেন। যাহারা তথাকথিত বাস্তব সাহিত্যপ্রিয় এবং যাহারা কবি-কল্পনার দ্বারা প্রবঞ্চিত হইতে চাহেন না, তাহারা এইরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু, কাব্যাদর্শ বাস্তবাদর্শ হইতে বিভিন্ন, ইহা ভুলিলে চলিবে না। কাব্যের জগৎ বাস্তব-জগতের যথাযথ চিত্র নয়, বরং ইহা একপ্রকার স্ব-প্রতিষ্ঠ, স্বয়ম্বশ, অখণ্ড জগৎ।

কবিতা কাহাকে বলে

অপরিহার্য্য শব্দের অবশ্যম্ভাবী বাণী-বিন্যাসকে কবিতা বলে।* এখন কথা হইল, অপরিহার্য্য শব্দ কাহাকে বলে? এবং শব্দ-ই বা কি? শব্দ ভাব-কল্পনা ও অর্থ-ব্যঞ্জনার বাহন, সুতরাং অপরিহার্য্য শব্দ উহার যথাযথ বাহন। যথাযথ শব্দই কবিতায় ব্যবহারোপযোগী একমাত্র শব্দ; এই

* নিম্নে কবিতার কয়েকটী বিখ্যাত সংজ্ঞা দেওয়া হইল :—

(১) Best words in the best order— *Coleridge.*

(২) Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings— *Wordsworth*

(৩) Poetry……is a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty— *Matthew Arnold*

(৪) Poetry is the nascent self-consciousness of man, not as an individual but as a sharer with others of a whole world of common emotion— *Caudwell.*

জাতীয় শব্দ লেখকের কল্পনা বা অনুভূতি-স্নিগ্ধ অন্তর হইতে স্বতঃ-উৎসারিত বলিয়া ভাবপ্রকাশের পক্ষে ইহা একান্ত উপযোগী। আবার, এই শব্দকে রসাত্মক বাণী-মূর্ত্তি দান করিবার জন্য কবি বস্তু-উপাদানের উপরে কল্পনার দীপ্তি—

The consecration, and the Poet's dream—

প্রতিফলিত করেন। 'অবশ্যম্ভাবী বাণী-বিন্যাস' বলিতে বুঝা যায় যে, অযত্ন-বিন্যস্ত শব্দে কবিতা হয় না। এইখানেই কবিতায় ছন্দের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়। অপরিহার্য্য শব্দ যথাবিন্যস্ত হইলেই তাহাদের মধ্যে চিত্রগুণ ও স্রোতোস্বিতার সৃষ্টি হয় এবং শব্দ সমূহ তখন রসাত্মক বাক্যে সমর্পিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী ছন্দোময় রূপ লাভ করে। সুতরাং দেখা যায়, মানবমনের ভাবনা কল্পনা যখন অনুভূতিরঞ্জিত যথাবিহিত শব্দ-সম্ভারে বাস্তব সুষমামণ্ডিত চিত্রাত্মক ও ছন্দোময় রূপ লাভ করে, তখনই উহার নাম কবিতা। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

অন্তর হ'তে আহরি বচন,
আনন্দলোক করি বিরচন
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে,

- তখন তিনি কবিতার জন্ম-ইতিহাস ও উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের উক্তি হইতে উপলব্ধি হইবে যে, কবি নিজের অন্তর হইতে 'বচন', কথা বা শব্দ-সম্ভার সংগ্রহ করিয়া আনন্দ-লোক সৃষ্টি করেন। কি উদ্দেশ্যে ?— না, সংসারের অভাব, অভিযোগ, দুঃখ, দৈন্য, কুশ্রীতা প্রভৃতির উপর গীত-রস সিঞ্চন করিয়া উহাদিগকে আরও উজ্জ্বল করিবার জন্য। কবি-কল্পনায় বাস্তবের এই নব-জন্মদানকে লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

নবীন আষাঢ়ে রচি' নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্তকায়া
বাসন্তীবাসপরা।

কবিতা

ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে অরণ্য ছায়
আরেকটু খানি নবীন আভায
রঙিন করিয়া দিব।

কবি কল্পনা-বলে অন্তর হইতে 'বচন' আহবণ করিয়া অতি-সাধারণকে অসাধারণ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করেন এবং যাহা শুধু ভাবময় ও বিদেহী ছিল, তাহাকে তিনি শরীরী করিয়া তোলেন। এই 'অপূর্ব্ববস্তু নির্ম্মাণক্ষম-প্রজ্ঞা' বা কবি-প্রতিভা—

কবি-কল্পনা

"শব্দ-বক্ষে ছন্দ-স্পন্দে, রূপ দেয় চঞ্চল তরলে,
ছায়ারে দানিছে কায়া শূন্য হতে টানিয়া সবলে,
সুসম্পূর্ণ করি তারে সুডৌল সুন্দর অবয়বে......" †

এই কল্পনার বলেই কবি জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা আমাদের নিকট উপস্থাপিত করেন। 'আমরা যাহা দেখি নাই, তাহা তাঁহার অনুগ্রহে বুঝিতে পারি। কবি অনেক স্থলে আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দেন; কুত্রাপি আমাদের চোখের উপর যদি কোন ময়লার আবরণ জন্মিয়া থাকে, তাহা মুছাইয়া দেন, কুত্রাপি বা চোখের উপর একখানা চশমা বা দূরবীণ এইরূপ একটা কিছু যন্ত্র ধরিয়া দেন। এই হিসাবে কবি এক রকম ডাক্তার।...যাহার রঙ দেখিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তিনি তাহাকে রঙ দেখিবার সামর্থ্য দিয়া অনুগৃহীত করেন।'*

কবিতা নিরাভরণা নয়। নারী যেমন আকার-ইঙ্গিতে, সাজসজ্জায়, বিলাসে প্রসাধনে আপনাকে মনোরমা করিয়া তোলে, কবিতাও তেমনি শব্দে, সঙ্গীতে, উপমায়, চিত্রে ও অনুভূতির নিবিড়তায় নিজেকে প্রকাশিত করে। ইহার উদ্দেশ্য আনন্দ দান, রস-সৃষ্টি। এই জন্যই সংস্কৃত আলঙ্কারিক বলেন, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।

কবিতার উদ্দেশ্য

† শ্রীমোহিতলাল মজুমদার : স্বর-গরল

* সমালোচনা-সংগ্রহ (*C. U.*)

এই 'রস' বস্তুটী কি ইহা লইয়া সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে শুধু এইমাত্র বলা যায় যে, রস একপ্রকার আনন্দময় মানসিক অবস্থা মাত্র। কাব্যপাঠে সহৃদয় লোকের মনে কাব্যের অনুরূপ ভাব সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে এমন এক নৈর্ব্যক্তিক ও আদর্শ জগতে লইয়া যায় যে, তিনি তখন তদ্গত হইয়া পড়েন; ফলে, কাব্যের ভাবানুভূতির সহিত তাঁহার একাত্মতা সৃষ্ট হয় অথবা নাটক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মধ্যে তাঁহার আত্মবিলুপ্তি সংসাধিত হয়। এই আত্মবিলুপ্তির মধ্য দিয়াই তিনি তখন ভাবজগতের তুরীয় লোকে উপনীত হইয়া অলৌকিক আনন্দ অনুভব করেন। এই যে অনুভূতি-সঞ্জাত নির্ম্মল আনন্দময় মানসিক অবস্থা, তাহাকে 'রস' বলে। সত্যকথা বলিতে কি, রস এবং রস-প্রতীতি এই দুইটী বস্তু ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না। কারণ যাঁহার রসানুভূতি বা রসপ্রতীতি হয় নাই, তিনি রস কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবেন না। রস ৯ প্রকার—শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র, বীভৎস, হাস্য, অদ্ভুত, করুণ, ভয়ানক ও শান্ত।

রস

কিন্তু এই আনন্দের স্বরূপ কি? সাহিত্যদর্পণকার বলেন যে, এই আনন্দ 'ব্রহ্মস্বাদসহোদর' অর্থাৎ কাব্য-পাঠে পাঠক এমন এক বিষয়ান্তর-নিরপেক্ষ রস-লোকে উত্তীর্ণ হন, যেখানে তিনি তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন। Hamilton-এর ভাষায় বলা যায়, Poetry, as such, is to be judged simply by the quality of imaginative experience it gives, and not by the test of moral goodness or of truth in reference to something outside itself."*

উপরি উক্ত আলঙ্কারিক আরও বলেন যে, কাব্য-রস হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তি হয়। †কাব্য কবির জীবনে যশ, সম্পদ ও অর্থ আনয়ন করে, এবং কাব্যের মধ্যে যে দেব-অর্চ্চনা থাকে তাহাতে কবির ধর্ম্মলাভ হয়। এবং ধর্ম্মের শেষ ফল মোক্ষ। কিন্তু, আধুনিক জগতে, কাব্য বা কবিতার প্রতি মানুষ ততখানি আস্থাবান নহে।

* *Poetry and Contemplation* † সাহিত্যদর্পণ, ১।২

বর্ত্তমান সভ্যতা 'কুবের-পূজারী'; সৌন্দর্য্যের স্থান এখানে অপেক্ষাকৃত গৌণ। তবে এইটুকু বলা অসমীচীন হইবে না যে, কবিতা বা কাব্য-রস মানুষের অন্তরের চিরন্তন সৌন্দর্য্য-পিপাসার পরিপোষক। বিশেষতঃ, কাব্য-পাঠে মানুষ কেবল সংসারের ধূলিজাল হইতে কল্প-লোকের সৌন্দর্য্য-জগতেই আশ্রয় গ্রহণ করে না, পরন্তু ইহার সাহায্যে মানুষ জীবনের গভীরতম রহস্যটীর পরিচয় লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হয়। কাব্যের জগৎ বস্তু-জগৎ না হইলেও ইহা অধিকতর সত্যজগৎ এবং কাব্য-জগতে প্রয়াণ অর্থ, বাস্তব-জগৎ হইতে বিচ্ছেদ নয়, বাস্তবের সহিত নিগূঢ় সংযোগ সাধন। কাব্যপাঠে অনেকের চিত্ত নিয়মিত হইয়া থাকে, অনেক 'অল্পবুদ্ধি সাধুলোক' ইহা হইতে শক্তি বা জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। কিন্তু কাব্য-বিচারে এই সকল তথ্য সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। 'সরস্বতীর আসন বস্তুপিণ্ডের উপরে নহে, পদ্মের স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য্যেই তাঁহার অধিষ্ঠান'— রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিই কাব্য-বিচারের কষ্টিপাথর রূপে গৃহীত হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে ম্যথু আর্ণল্ডের কবিতার সংজ্ঞাটী ভাবিয়া দেখা দরকার। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার মতে শ্রেষ্ঠ কবিতা জীবন-দীপিকা (Criticism of life) বা জীবন-জিজ্ঞাসা মাত্র। তাঁহার মতে শ্রেষ্ঠ কবিতা পাঠে পাঠক কবির সুগভীর আন্তরিকতা ও বিষয়-তন্ময়তায় প্রবুদ্ধ হয়। কাব্যে, বিষয়-বস্তু কাব্যসত্যে ও কাব্য-সৌন্দর্য্যে পরিবেশিত হইয়া এমনভাবে উপস্থাপিত হইবে যেন পাঠক কবির সুগভীর আন্তরিকতা ও বিষয়-তন্ময়তায় সন্দেহ প্রকাশ করিতে না পারে। তিনি আরও বলিতে চাহেন যে, কবি বা ঔপন্যাসিক আদর্শ-গত জীবনালেখ্য চিত্রিত করিয়া বাস্তব জীবনের সহিত তুলনা করিবার ইঙ্গিত দান করিবেন। আদর্শগত জীবন ও বাস্তব জীবনের তুলনা হইতে আমরা জীবন ও জগতের সাধারণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারি। এইভাবে শ্রেষ্ঠ কাব্য আমাদের নিকট জীবন-দীপিকার কাজ করে। শ্রেষ্ঠ কবি জীবনের আদর্শগত চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে পাঠকের মনে একদিকে যেমন জীবন-রহস্য

আলোকিত করিয়া তোলেন, তেমন আবাব কী ভাবে জীবনযাপন করিতে হইবে, এই গভীর প্রশ্নের উত্তর দানে সাহায্য করেন। বলা বাহুল্য, ম্যথু আর্ণল্ড্ কাব্যের প্রকৃতি-নির্ণয়ে কাব্যকে ব্যক্তি-গত স্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়াও কাব্যে নীতির প্রাধান্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কাব্যবিচারে নীতি-প্রাধান্য আনিলে কাব্যকে ছোটই করা হয়—কারণ কাব্যের নীতি ইহার নির্ম্মাণ-নীতি ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। এবং কাব্য মূলতঃ নীতিবাচকও নয়, নীতিদ্রোহীও নয়, ইহা নীতির উর্দ্ধে। কাব্যবিচাবে কাব্যের বহির্ভূত কোন নীতিবাদ বা সত্যবোধের মানদণ্ড ব্যবহার চলিতে পারে না।

এখন আমরা কবিতা সম্বন্ধে মূল কয়েকটী কথার পুনরাবৃত্তি কবিতেছি—

(১) কবিতায় আমরা সাধাবণতঃ বাহ্য-জগত ও মানব জীবনেব কাহিনী এবং ভাব-কল্পনা সুন্দর ও মনোবম করিয়া পাই। সংসার-ধূলিজাল কল্পনার কোমল স্পর্শে কবিতার রাজ্যে আরও মধুব, আবও সুন্দর হইয়া উঠে।

(২) কবিতা ভাবকে রূপে পরিবর্ত্তন করে। 'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসার' তত্ত্বই কবিতায় প্রকাশিত। যাহা অদেহী, অ-রূপ, সূক্ষ্ম বা ইন্দ্রিয়াতীত, কবি তাহাকে দেহ, রূপ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত্তি দান করেন।

(৩) বিশুদ্ধ কবিতার (Pure Poetry) জন্ম মনে নয়, প্রাণে, বুদ্ধি-বৃত্তিতে নয়, অনুভূতিতে।

(৪) কবিতার চিবন্তন আবেদন আমাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য-বোধের নিকট। ইহা ভাব-সঞ্চারী বলিয়া আমাদের মনে বিচিত্র রস উদ্দীপন করে। কিন্তু সর্ব্বত্রই ইহা সৌন্দর্য্য-বোধের পরিপোষক। কবির এই সৌন্দর্য্য-বোধের সত্যতাব সহিত দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক সত্যের বিভিন্নতা আছে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিচাবেব দ্বাবা যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন,

তাহা অসুন্দর হইলেও সত্য। কিন্তু, কবি যে-সত্য আবিষ্কার করেন, তাহা সুন্দর হইবেই।

(৫) কবিতার একটী বিশেষত্ব ইহার ছন্দ। এই সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে, ছন্দ কবিতার পক্ষে অপরিহার্য্য নহে। তাহারা এইজন্য ছন্দোহীন রচনাকেও কবিতা বা কাব্য নামে আখ্যাত করিতে চাহেন। Wordsworth বলিয়াছিলেন যে, কবিতা ও গদ্যের ভাষায় বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।* কিন্তু কবিতা লিখিবার সময় এই নির্দেশ তিনি নিজেও মানিয়া চলেন নাই। Wordsworth-এর এই উক্তির উত্তরে সত্য-দৃষ্টি সম্পন্ন Coleridge বলিয়াছিলেন—There *may be, is* and *ought to be* an essential difference between the language of prose and of metrical composition †

অধুনা নিশ্ছন্দ কবিতা নামে এক প্রকার কবিতা লিখিত হইতেছে। যাহা হউক, আমাদের বক্তব্য এই যে, গদ্য যদি ভাব-সঞ্চারে, সঙ্গীত-মাধুর্য্যে ও স্রোতোশীলতায় পাঠকের মনে আনন্দ সঞ্চার করিতে পারে, তবে উহাকে কবিতা না বলিয়া, কবিতা-ধর্ম্মী গদ্য বলা যাইতে পারে। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'শ্মশান বর্ণনা', বঙ্কিমচন্দ্রের 'হিন্দুগৌরব' বর্ণনা বা শরৎচন্দ্রের 'রাত্রির রূপ' বর্ণনা—প্রভৃতিকে কবিতা না বলিয়া কবিতা-ধর্ম্মী গদ্য বলাই যুক্তিযুক্ত। ছন্দ থাকিলেই কবিতা হয়, এবং ছন্দ না থাকিলে কবিতা হয় না, এইকথা অবশ্য গ্রাহ্য নহে। তবে, ইহাও সত্য যে, সারস্বতসমাজ ছন্দকে কবিতা-লক্ষ্মীর অপরিহার্য্য অলঙ্কার রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ছন্দের আপাতঃ-বন্ধনে যে মুক্তির আবেগ আছে, তাহা কবিতা-সৃষ্টির একান্ত সহায় মনে করিয়াই বোধ হয় বিবুধ জন ইহাকে কবিতার অলঙ্কাররূপে মানিয়া লইয়াছেন।

* 'There neither is, nor can be, any essential difference between the language of prose and metrical composition'— *Preface to Lyrical Ballads.*

† *Coleridge Biographia Literaria*

এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ছন্দের একটা অনিবার্য্য প্রবাহ আছে, সেই প্রবাহের মাঝখানে একবার ফেলিয়া দিতে পারিলে কবিতা সহজে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু গদ্যে নিজে পথ দেখিয়া পায়ে হাঁটিয়া নিজের ভাব-সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়; সেই পদব্রজ বিদ্যাটা রীতিমত অভ্যাস না থাকিলে চাল্ অত্যন্ত আঁকাবাঁকা এলোমেলো এবং টলমলে হইয়া থাকে'।

মন্ময় ও তন্ময় কবিতা

কবিতা প্রধানতঃ দুই প্রকার। *Subjective* বা মন্ময় কবিতা এবং *Objective* বা তন্ময় কবিতা। কবি যখন নিজের আন্তর অনুভূতি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ভাবনা চিন্তা বা বহির্গত অনুভূতি তাঁহার কাব্যের সামগ্রী মাত্র রূপে গ্রহণ করিয়া আত্ম-প্রকাশ করেন, তখন আমরা তাঁহাব সৃষ্টিকে মন্ময় বা ব্যক্তিনিষ্ঠ কবিতা বলি। এই জাতীয় কবিতা এক হিসাবে কবির আত্ম-চরিত বা আত্ম-বাণী। কবি যখন বস্তু-জগতকে যথাযথ রূপে প্রকাশ করেন, তখন আমরা তাহাকে তন্ময় বা বস্তু-নিষ্ঠ কবিতা নামে অভিহিত করিতে পারি। মন্ময় কবিতায় কবির ব্যক্তি-অনুভূতির নিবিড়তাই প্রধান, তন্ময় কবিতায় বস্তু-সত্তাই প্রধান। এই শ্রেণী-বিভাগ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে, সম্পূর্ণ রূপে তন্ময় বা সম্পূর্ণ রূপে মন্ময় কবিতা অসম্ভব।

একান্ত বস্তু-নিষ্ঠ কবিতায়ও মাঝে মাঝে কবি-প্রাণের শিহরণ সঞ্চারিত হইয়া থাকিতে পারে এবং একান্ত ব্যক্তি-নিষ্ঠ কবিতায়ও মাঝে মাঝে বস্তু-সত্তার প্রাধান্য লক্ষিত হইতে পারে। মন্ময় ও তন্ময় কবিতাকে আবার যে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, তাহা পরপৃষ্ঠার তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে :—

কবিতা

- মন্ময় বা গীতিকবিতা (Subjective Poetry)
  - ভক্তিমূলক (Devotional)
  - স্বদেশ প্রীতিমূলক (Patriotic)
  - প্রেমমূলক (Love, *or*, Erotic)
  - প্রকৃতিবিষয়ক (Nature)
  - সনেট (Sonnet)
  - স্তোত্র (Ode)
  - চিন্তামূলক (Reflective)
  - শোক-গীতি (Elegy)
  - *Vers de Societe* লঘু বৈঠকী-কবিতা
- তন্ময় বা বস্তু-নিষ্ঠ কবিতা (Objective Poetry)
  - গাথা (Ballad)
  - মহাকাব্য (Epic)
  - নীতি-কবিতা (Didactic)
  - রূপক (Allegory)
  - ব্যঙ্গ-কবিতা (Satire)
  - লিপি-কবিতা (Epistle)

৪

গীতিকবিতা

কবির একান্ত ব্যক্তি-অনুভূতি যখন সহজ ও স্বলীল গতিতে সঙ্গীত-মুখর হইয়া আত্ম-প্রকাশ করে, তখনই গীতিকবিতার জন্ম। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।" গীতিকবিতা অনুভূতির প্রকাশ বলিয়া সাধারণতঃ দীর্ঘকায় হয় না। কারণ, কোন অনুভূতিই দীর্ঘকাল স্থায়ী নয়। কিন্তু কোন কবি যদি গীতিকবিতায় তাঁহার ব্যক্তি-অনুভূতিকে আন্তরিকতার সহিত অনায়াসে দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিতে পারেন, তবে তাহার মূল রস ক্ষুণ্ণ হয় না। কবির আন্তরিকতাই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার একমাত্র লক্ষণ।

গীতিকবিতা ও গান

ইংরেজী সাহিত্যে গীতিকবিতা *Lyric* নামে অভিহিত। বীণাযন্ত্র যোগে এই শ্রেণীর সঙ্গীত-কবিতা গীত হইত বলিয়া ইহাকে *Lyric* বা গীতিকবিতা বলা হইত। এইখানে গান ও গীতিকবিতার পার্থক্য মনে রাখা দরকার। শব্দচয়ন ব্যাপারে গান রচয়িতার স্বাধীনতা নাই, কারণ সুরাত্মক ও সহজে উচ্চারণ করা যায় এমন শব্দই তাহার পক্ষে উপযোগী। গানে ছন্দবৈচিত্র্য সম্ভব নয়, কারণ কোন বিশিষ্ট ছন্দের পুনরাবৃত্তির সাহায্যে গানরচয়িতাকে গানের মূল ভাবটীকে গভীরতর করিয়া তুলিতে হয়। এতদ্ব্যতীত, গানে সুরের প্রাধান্য, গীতিকবিতায় কথা ও সুরের সমন্বয়। গানে একাধিক ভাব-কল্পনা সম্ভব নয়, গীতিকবিতায় ভাবকল্পনার বিচিত্রতা ও সঙ্গতি শুধু সম্ভবপর নয়, সুসাধ্যও বটে। অধুনা, যে-কবিতায় কবির আত্মানুভূতি বা একান্ত ব্যক্তিগত বাসনা-কামনা ও আনন্দ-বেদনা তাঁহার প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে আবেগ-কম্পিত সুরে অখণ্ড ভাবমূর্তিতে আত্ম-প্রকাশ করে, তাহাকেই গীতিকবিতা বলে। ইহাতে পরিপূর্ণ মানব-জীবনের ইঙ্গিত নাই; ইহা একক পুরুষের একান্ত ব্যক্তিগত আনন্দ-

বেদনায় পরিপূর্ণ। কবি এইখানে আত্ম-বিমুগ্ধ তই সমস্তটী কবিতা ব্যাপিয়া তাহার প্রাণ স্পন্দন অনুভব করা যায়। কবির ব্যক্তি-অনুভূতি অথবা বিশিষ্ট মানসিকতা ইহাকে স্নিগ্ধ কান্তি দান করে। তাঁহার চরিত্রের কমনীয়তা, নমনীয়তা বা দৃঢ়তা ইহাতে প্রতিফলিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, গীতকবিতা কবির আত্ম-মুকুর। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'যাহাকে আমরা গীতিকাব্য বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ, ঐ যেমন বিদ্যাপতির—

ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর,—

সে-ও আমাদের মনের বহুদিনের, অব্যক্ত ভাবের একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা' *। গীতিকবিতার মধ্যে আমরা আন্তরিকতাপূর্ণ অনুভূতি, অবয়বের স্বল্পতা, সঙ্গীত-মাধুর্য্য ও গতি-স্ব চ্ছন্দ্য—এই কয়েকটী জিনিষ প্রত্যাশা করি। বলা বাহুল্য যে, গীতিকবিতা গান না হইলেও, আজ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যে গীতি-কবিতা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সুরের প্রাধান্য অব্যাহত রহিয়াছে।

এইখানে বৈষ্ণব গীতিকবিতা ও আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার প্রভেদ লক্ষ্য করা সমীচীন। বৈষ্ণব কবিতা গান হিসাবে লিখিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিগণ প্রত্যেকেই একটী বিশিষ্ট সম্প্রদায়-ভুক্ত এবং তাহাদের সাধনমার্গও সম্প্রদায়গত ছিল। তাই তাহাদের কাব্যে ব্যক্তিগত কথা অপেক্ষা সম্প্রদায়গত ও বিশিষ্ট সাধনতত্ত্বগত বাণীই অপূর্ব্ব বাণী বিন্যাসে গীতি-রূপ লাভ করিয়াছে। আধুনিক গীতিকবিতা মূলতঃ গান নহে, উহা প্রধানতঃ কবিতা, এবং দ্বিতীয়তঃ কবির ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার স্বতঃস্ফূর্ত্ত গীতিরসোচ্ছল কবিতা। বৈষ্ণব কবিতায় গোষ্ঠীগত ধর্ম্ম-চেতনা মানবরসকে ধর্ম্মরসে অভিষিক্ত করিয়াছে, আধুনিক গীতিকবিতার

বৈষ্ণব কবিতা ও আধুনিক গীতিকবিতা

* রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্য

বিশ্বচেতনা কবির আত্মচেতনায় মানবরসে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব কবি মূলতঃ দ্বৈতবাদী বলিয়া তাঁহার জগৎ-দর্শন রাধাকৃষ্ণ রূপকের মধ্য দিয়া প্রকাশিত, আধুনিক গীতিকবির জগৎ-দর্শন কোন রূপকের মধ্যে ধরা দেয় নাই। বৈষ্ণব কবিতার বিষয়-বস্তু মাত্র প্রেম, আধুনিক গীতিকবিতার বিষয়বস্তু অনন্ত জগৎ। বৈষ্ণব কবিতার বিশিষ্ট ব্যক্তি-অনুভূতি পরোক্ষ, আধুনিক গীতি-কবিতার বিশিষ্ট ব্যক্তি-অনুভূতি প্রত্যক্ষ। তথাপি বলিতে হইবে যে, বৈষ্ণব কবিতা আধুনিক যুগের গীতিকবিতায় পর্য্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার গানের সুরটীই রবীন্দ্রকাব্যের সুরমাধুর্য্যে ধরা পড়িয়াছে, এমন কি বৈষ্ণবকবিতার রাধাকৃষ্ণ প্রেম রবীন্দ্রকাব্যে 'তুমি আর আমি'-র প্রেমের মধ্যে আত্মস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে।

মোটামুটি হিসাবে গীতিকবিতার নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে।

(১) ভক্তিমূলক

যে গীতিকবিতা ধর্ম্ম বা ভক্তিভাব অবলম্বনে লিখিত তাহাকে ভক্তিমূলক গীতিকবিতা বলে। ঋক্‌বেদের স্তোত্রমালা, অক্ষয়কুমার বড়ালের 'কোথা তুমি', রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কবিতা-নিচয়, রজনীকান্ত সেনের 'নির্ভর,' কামিনী রায়ের 'প্রণতি' প্রভৃতি ভক্তিমূলক গীতিকবিতা শ্রেণীভুক্ত।

(২) স্বদেশপ্রীতি-মূলক

যে গীতিকবিতা কবির স্বদেশ-প্রীতি আশ্রয় করিয়া রূপ পরিগ্রহ করে, তাহাকে স্বদেশপ্রীতি-মূলক গীতিকবিতা বলে। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি, দেশের মাটীর প্রতি কবির সশ্রদ্ধ অনুরাগ, বা দেশের অতীত বীর-কাহিনীর প্রতি একান্ত অনুরাগ হেতু কবি ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার ব্যক্তি-অনুভূতির মধ্য দিয়া দেশ-চিত্তের অনুভূতিকে প্রকাশ করেন। ফরাসী স্বদেশ-সঙ্গীত *The Mersellaise*, ভারতীয় 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে', যদুগোপালের 'জন্মভূমি', দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত।

প্রেমমূলক গীতিকবিতায় প্রেমের আশা-নৈরাশ্য, বেদনা-মধুরতা প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া কবি আত্ম-গত ভাব-কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপ দান করেন। ইংরেজী সাহিত্যে Donne-এর *'The Ecstasy'*, Burns-এর *My love is like a red, red, rose'*, রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয়-যমুনা', গোবিন্দ দাসের 'আমি তোরে ভালবাসি' এবং বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' উল্লেখযোগ্য।

(৩) প্রেমমূলক

প্রকৃতি-বিষয়ক গীতি-কবিতায় কবি বাহ্য-প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দকে নিজের অন্তর রসে রসায়িত করিয়া আত্ম-গত ভাব-কল্পনার অনুরূপ মূর্ত্তি দান করেন। Keats-এর *Autumn*, রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল', নজরুল ইস্‌লামের 'বাদল দিনে', গোবিন্দ দাসের 'বর্ষার বিল' এই জাতীয় কবিতা।

(৪) প্রকৃতি-বিষয়ক

সনেট শব্দটী ইটালীয়ান 'সনেটো' (মৃদুধ্বনি) শব্দ হইতে উদ্ভূত। ইহা এক প্রকার মন্ময় কবিতা। একটী মাত্র অখণ্ড ভাব-কল্পনা, বা অনুভূতি-কণা যখন ১৪ অক্ষর সমন্বিত (কখনো কখনো ১৮ অক্ষরও ব্যবহৃত হয়) চতুর্দ্দশ পংক্তিতে একটী বিশেষ ছন্দ-রীতিতে আত্মপ্রকাশ করে, তখন আমরা উহাকে সনেট নামে অভিহিত করি। ইটালীয়ান কবি Petrarch (১৩০৪—৭৪) ইহার জন্মদাতা। সনেটের ইতিহাসে পেত্রার্ক, দান্তে, ট্যাসো অপেক্ষা ইংরেজী সনেট লেখকগণ কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে Wyatt এবং Surrey সর্ব্বপ্রথম সনেট কবিতা লিখেন। ইংরেজী সাহিত্যে সেক্স্‌পীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, এলিজাবেথ ব্যারেট্ ব্রাউনিং, ডি. জি. রসেটি, রুপার্ট ব্রুক প্রভৃতি সুবিখ্যাত সনেট রচয়িতা।

(৫) সনেট

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চতুর্দ্দশ পংক্তিতে এই ধরণের কবিতা সুগঠিত। মধুসূদন দত্ত ১৪ অক্ষরই বাংলা সনেটের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং আজ পর্য্যন্ত কৃতী সনেট লেখকগণ এই নিয়মই পালন করিয়াছেন। সনেটের প্রথম আট লাইনে যে ভাব-কল্পনার ইঙ্গিত করা হয়, তাহাকে অষ্টক (*Octave*) বলে, পরবর্ত্তী যে-ছয় লাইন পূর্ব্বোক্ত ভাব-

কল্পনার বিস্তৃতি সাধন বা ব্যাখ্যা করে, তাহাকে ষট্‌ক (*Sestet*) বলে। অনেক কবি এই দুইটী বিভাগ না মানিয়া এই জাতীয় কবিতাকে একটী অখণ্ড কবিতা-মূর্ত্তি দান করেন। অষ্টকের আট লাইন আবার দুই ভাগে বিভক্ত— চার লাইন সমন্বিত প্রত্যেকটী ভাগের নাম (*Quatrain*); ষট্‌কের তিন লাইন সমন্বিত দুই ভাগের প্রত্যেক ভাগকে ত্রিপদিকা (*Tercet*) বলে। মনে রাখিতে হইবে যে, সমগ্র কবিতাটি যেন একটী অখণ্ড ভাবের দ্যোতনা করে। পংক্তিগুলির ছন্দ-প্রকরণ সাধারণতঃ **কখখক, কখখক, গঘঙ, গঘঙ,** অথবা **কখখক, কখখক, গঘ গঘ, গঘ,** অথবা **গঘঙ, ঘগঙ**। Shakespeare এই সনাতন পন্থা মানিয়া চলেন নাই; Milton এবং Wordsworth প্রায়শঃই ইটালীয়ান পন্থানুগ, Shakespeare-এর সনেটের ছন্দপ্রকরণ এই— **কখ, কখ, গঘ, গঘ,** ঙচ, ঙচ, **ছছ**। সেক্স্‌পীয়র অষ্টক ও ষট্‌ক-বিভাগ মানিয়া চলেন নাই। নিম্নে একটী সনেটের ছন্দ-বিন্যাস দেখান হইল:—

সায়ংকালের তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি, ক
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে? খ
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে খ
রতন তোমার মত, কহ সহচরি— ক
গোধূলির? কি ফণিনী, যার সু-কবরী ক
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে?— খ
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে খ
কি হেতু? ভাল কি তোমা বাসে না শর্ব্বরী? ক

হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ মনে গ
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে ঘ
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল সনে, গ
যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে? ঘ
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে? গ
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে। ঘ

—মধুসূদন দত্ত

অনেকে বলেন, সনেটের মধ্য দিয়া কবি আত্মজীবন-কথা বিবৃত করেন। সনেট গীতিকবিতা, সুতরাং কথাটা একেবারে অমূলক নয়। দেবেন্দ্র সেনের সনেটে কবি-প্রাণের অন্তর অনুভূতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজীতে সেক্সপীয়র ও ডি. জি. রসেটির সনেটে কবির গোপনতম অন্তরটি পরিস্ফুট হইয়াছে। 'আধুনিক সনেটের মন্ময়তা, একান্ত ব্যক্তিনিষ্ঠতা অপেক্ষা আরও ব্যাপক। কবির উদ্দেশ্য এইখানে আত্মচরিত বিবৃতি নয়, আত্ম-ভাবনা-কল্পনার সংযত প্রকাশ। কল্পনাসর্ব্বস্ব সংযম-জ্ঞানহীন কবি সনেট কবিতায় সাফল্য লাভ করিতে পারেনা।

সনেটের নির্ম্মাণরীতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার :—

(১) ইহা সাধারণতঃ চতুর্দ্দশ অক্ষর সমন্বিত চতুর্দ্দশটি পংক্তির কবিতা।

(২) ইহাতে একটীমাত্র ভাবের দ্যোতনা থাকে।

(৩) অষ্টক ও ষট্‌কের বিভাগ রক্ষা করা সনাতন রীতি হইলেও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকে এই নিয়ম মানিয়া চলেন নাই।

(৪) সনেটের ভাবে গভীরতা ও ভাষায় ঋজুতা থাকিবে।

(৫) বিশেষ নির্ম্মাণ-রীতি অনুসরণ করিতে হয় বলিয়া সনেটের স্বতঃস্ফূর্ত্তি অন্যান্য গীতিকবিতার তুলনায় অনেক কম।

বাংলা সনেট রচয়িতা হিসাবে মধুসূদনের নাম সর্ব্বাগ্রে গণ্য। তিনিই বাংলা সনেটের আকৃতি ও ছন্দ-বিন্যাস নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন।

বাংলা সনেট

অধিকাংশ সনেটে সনাতন রীতি না মানিলেও এই শ্রেণীর কবিতার পথিকৃৎ হিসাবে তিনি স্মরণীয়। তাঁহার 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর' মধ্যে ভাবৈশ্বর্য্যের দিক হইতে 'বঙ্গভাষা' উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের পরবর্ত্তী নবীনচন্দ্র বা হেমচন্দ্রে সনেটের বিশেষ সাক্ষাৎ পাওয়া যায়না। তাঁহার পর দেবেন্দ্রনাথের 'অশোকগুচ্ছে' যে ভাবগভীর সংহত সনেট পাওয়া যায়, বাংলা কাব্যসাহিত্যে তেমনটি খুব সুলভ নয়। ইহার পর অক্ষয়কুমার বড়াল। তাঁহার ভাব ও ভাষা উভয়ই প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁহার সনেট তেমন গীতিরসোচ্ছল

নয়। অক্ষয়কুমারের পর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সনেটে একটী অখণ্ড ভাবের প্রকাশ থাকিলেও আঙ্গিকের দিক দিয়া উহাদের সম্পূর্ণতা নাই এবং মূলতঃ উহারা চতুর্দ্দশপদী কবিতা মাত্র। ইহাদের মধ্যে গীতিরসের উচ্ছ্বলতা আছে, সংযম নাই। প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশৎ' লঘু সনেট-পরম্পরা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালে যাঁহারা সনেটে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তন্মধ্যে সুশীলকুমার দে, মোহিতলাল মজুমদার, অজিত দত্ত ও প্রমথনাথ বিশীর নাম করা যাইতে পারে।

প্রাচীনকালে গ্রীকসাহিত্যে Chorus কর্ত্তৃক রঙ্গমঞ্চের উপর বিভিন্ন সুরে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় সঙ্গীত ও নৃত্যসহযোগে যে গান গীত হইত, তাহাই *Ode* বা স্তোত্র নামে অভিহিত। গ্রীক Ode এক বা বহুকণ্ঠে গীত হইবার প্রথা ছিল। গ্রীক সাহিত্যে Alcæus, Sappho, Anacreon, Pindar প্রমুখ কবিগণ স্তোত্রকবিতা রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে Pindar-এর রচিত স্তোত্রকবিতায় *strophe, anti-strophe* এবং *epode* নামধেয় সুবিহিত শ্লোক-বিভাগ দৃষ্ট হয়। ইংরেজী সাহিত্যে Gray এবং Collins কখনো কখনো Pindar-এর অনুকরণে কবিতা লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের কবিতা সর্ব্বাংশে গ্রীকধর্ম্মী হইয়া উঠে নাই। কারণ গ্রীক কবিতায় নৃত্য-গীতের সংযোগ হেতু তাহা যতখানি জীবন্ত মনে হয়, ইংরেজী কবিতায় তাহা না থাকায় * উপরি উক্ত শ্লোক-বিভাগ ততখানি মূর্ত্ত হইতে পারে নাই। এইজন্য ইংরেজী স্তোত্রকবিতা গ্রীকপন্থী কবিতা হইতে পৃথক হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে। অধুনা যে প্রশস্তিমূলক (address) গীতি-কবিতায় কোন সুমহান বা গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক বিষয়-বস্তু বা উপাদান আশ্রয় করিয়া কবি বিভিন্ন ধরনের ওজস্বী ছন্দে আত্মগত অনুভূতির ভাবমূর্ত্তি দান করেন, তাহাকে *Ode* বা **স্তোত্রকবিতা** নামে অভিহিত করা হয়। ইংরেজী সাহিত্যে Milton, Gray, Wordsworth, Keats প্রভৃতি উৎকৃষ্ট স্তোত্রকবিতা রচনা করিয়াছেন। বাংলায় সুরেন্দ্র মজুমদারের

(৬) স্তোত্রকবিতা

*Dryden ও Gray-র স্তোত্রকবিতা সঙ্গীত সহযোগে গীত হইবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।

'মাতৃস্তুতি', রঙ্গলালের 'প্রসীদ সিদ্ধ ঈশ্বরি', রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' ও মোহিতলালের 'নারী-স্তোত্র' উল্লেখযোগ্য।

চিন্তামূলক গীতিকবিতায় কবি জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে রূপ দান করেন। হেমচন্দ্রের 'জীবন-সঙ্গীত', রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব', প্রমথনাথ চৌধুরীর 'বেলা যায়' এই শ্রেণীর কবিতা।

(৭) চিন্তামূলক

শোকসঙ্গীতে (*Elegy*) কবি ব্যক্তিগত বা জাতীয় শোক-কাহিনীকে ভাষা দান করেন। যখন কবিতায় ব্যক্তি-বিশেষের শোকানুভূতি রূপলাভ করে, তখন উহাকে *Monody* কহে। শোকানুভূতির আন্তরিকতাই শোকসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মানদণ্ড। কোন কোন শোকসঙ্গীতে কবির ব্যক্তিগত বেদনা সর্ব্বমানবের বেদনারূপে ভাষা পাইয়া থাকে। ইহাতে অবশ্য উহার মর্য্যাদা আরও বর্দ্ধিত হয়। বাংলা সাহিত্যে শোকসঙ্গীতেব মধ্যে বিহারীলালের 'বন্ধু বিয়োগ', অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা', রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ', করুণানিধানের 'মহাপ্রয়াণে' ও গোলাম মোস্তাফার 'হাজি মহম্মদ মহসীন' বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। অনেক সময় শোককবিতা স্বর্গত বন্ধুর স্তুতি-সূচকও হইতে পারে। Tennyson-এর *In Memoriam*-এ কবির বন্ধুপ্রীতি, বন্ধুর স্মৃতিপূজা ও কবির জীবন-জিজ্ঞাসার সমন্বয় হইয়াছে। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে শোকগীতি অনেক সময় সাহিত্য-সমালোচনার বাহন রূপেও ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সত্যেন দত্ত' ও Matthew Arnold-এর *Heine's Grave*-এর নাম করা যাইতে পারে।

(৮) শোকগীতি

যে-ধরণের গীতিকবিতায় জীবনের লঘু আনন্দের দিকটী ও সমাজ-জীবনের লঘু-চিত্রটী কবির ব্যক্তি-অনুভূতি দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহাকে *Vers de Societe* বা লঘু বৈঠকী-কবিতা বলে। ইংরেজী সাহিত্যে Austin Dobson, Herrick এবং বাংলায় অপরাজিতা দেবী এই শ্রেণীর কবিতা লিখিয়াছেন।

(৯) *Verse de Societe* *or.* Convival lyric

বাংলা গীতিকাব্যের ইতিহাসে বিহারীলালের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। ইতিপূর্ব্বে অবশ্য মধুসূদন (১৮২৪—৭৩) ব্রজাঙ্গনাকাব্যে বৈষ্ণবকবির সুরমাধুর্য্য ও ভাবমাহাত্ম্যটী অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং কয়েকটী চতুর্দ্দশপদী কবিতায় ও 'আত্মবিলাপে' গীতিকবিতার রূপটী মূর্ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিহারীলালই (১৮৩৪—৯৪) প্রথম খাঁটী প্রাণের ভাষায় প্রাণের গভীর আকূতিটী বাংলা কাব্যে প্রকাশ করেন। তাঁহার 'সারদামঙ্গল' একটী অপরূপ গীতি-কবিতাগুচ্ছ। বিহারীলালের আত্মনিষ্ঠতা ও ব্যক্তিগত ভাবতন্ময়তা পরবর্ত্তী কবি অক্ষয়কুমার বড়ালে (১৮৬০—১৯১৮) পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার গীতিকাব্যের মধ্যে প্রদীপ, কনকাঞ্জলি ও এষা বিখ্যাত। দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫৫—১৯২০) অধিকাংশ গীতিকবিতায় নারী কল্পনা-কান্ত রূপে বিভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'অশোকগুচ্ছ' উৎকৃষ্ট। বিহারীলাল ও দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব কালের মধ্যে যে কয়েকজন গীতিকবির পরিচয় পাওয়া যায় তন্মধ্যে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৭—১৯০০), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩) সুরেন্দ্র মজুমদার (১৮৩৮—৭৮), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৪০—১৯২৬) ও নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৬—১৯০৯) নাম করা যাইতে পারে। হেমচন্দ্রের সহজ ভাবপ্রবণতা, সুরেন্দ্রনাথের বুদ্ধি-কঠিনতা, দ্বিজেন্দ্রলালের লঘু-সরসতা ও নবীনচন্দ্রের উচ্ছ্বাসপ্রবণতা বিশেষ লক্ষণীয়।

বাংলা-গীতিকাব্য

দেবেন্দ্রনাথের পর স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাস (১৮৫৫—১৯১৮)। নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বেদনা তাঁহার কাব্যে একটী অপরূপ সাবলীল বাণীমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রেমকাব্যের তীব্র বাস্তবানুভূতি বাংলা সাহিত্যে সত্যই দুর্লভ। কুঙ্কুম, কস্তুরী, প্রেম ও ফুল এবং বৈজয়ন্তী তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁহার পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১)। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে 'শেষলেখা' পর্য্যন্ত অজস্র গীতি-কবিতায় ও গানে বাংলা কাব্যসাহিত্যকে তিনি বিশ্বসাহিত্যের তুল্য মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। ভাষা ও ছন্দকে তিনি কত রূপে কত বর্ণে সাজাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক তিনজন মহিলা কবিও—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮—১৯২৪), মানকুমারী বসু (১৮৬৩—১৯৪৩) ও কামিনী রায় (১৮৬৪—১৯৩৩)—বাংলা গীতিকাব্যে বিশিষ্ট সুর সংযোজনা করিয়াছেন। 'অশ্রুকণার' কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর সহজ সৌন্দর্য্যবোধ ও বেদনাবিধুরতা, 'কাব্য কুসুমাঞ্জলি'র কবি মানকুমারীর আদর্শপ্রবণতা ও 'আলো ও ছায়ার' কবি কামিনী রায়ের বেদনা-কান্ত জীবনানুভূতি বাংলা গীতিকাব্যে একটী বিশিষ্ট কোমলতা সঞ্চার করিয়াছে।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭) প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনা, চিত্রাত্মক কল্পনা ও শব্দচয়ন-শিল্পে অনন্যসাধারণ। প্রসাদী, ঝরাফুল, ধানদূর্ব্বা তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮) বাঙ্গালী জীবনের সুখ দুঃখ ও বাংলার পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনায় একটী সহজাত আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রেখা, অপরাজিতা ও মহাভারতী বিখ্যাত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮১—১৯২২) রবীন্দ্র-শিষ্য হইলেও ভিন্ন কবিপ্রকৃতি সম্পন্ন। তাঁহার গীতিকবিতায় অনুভূতি অপেক্ষা মনন-শীলতা বেশী। কিন্তু বিচিত্র ছন্দের উপর তাঁহার অসামান্য অধিকার। 'কুহু ও কেকা', 'অভ্র-আবীর' ও 'বেলা শেষের গান' তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের ভক্তি-রসাপ্লুত প্রেমকাব্যের সুরটী কুমুদরঞ্জন মল্লিকে (১৮৮২) নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। বনতুলসী, বীথি ও নূপুর তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। 'নতুন খাতার' কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭—১৯৩১) বেদনা-মধুর অপূর্ব্ব গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন। যতীন্দ্র সেনের (১৮৮৭) কাব্যে বেদনার অশ্রু আত্মস্থ ভাবকল্পনায় নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া ও সায়ম্ তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮) রবীন্দ্রযুগের হইলেও কাব্যে সনাতন রীতির পক্ষপাতী; ভাবগভীরতা ও চিত্রাত্মক কল্পনা তাঁহার কবিতার বিশেষত্ব। স্বপনপসারী, বিস্মরণী ও স্মরগরল তাঁহার কাব্যগ্রন্থ। কালিদাস রায়ের (১৮৮৯) কাব্যে বাংলার

মাঠঘাট ও পল্লীপ্রকৃতি মমতা-স্নিগ্ধ রূপ পাইয়াছে। কুন্দ, পর্ণপুট ও ব্রজবেণু তাঁহার কাব্যগ্রন্থ। 'বিদ্রোহী'কবি নজরুল ইস্‌লাম (১৮৯৯) বাংলাকাব্যে বিশেষ একটী দৃপ্ত ছন্দগরিমা সঞ্চার করিয়াছেন। তিনি অসংখ্য শ্রুতিমধুর গানও রচনা করিয়াছেন। অগ্নিবীণা ও বুলবুল তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ। জসীমউদ্দিনে (১৯০৩) বাংলার অবহেলিত মানবজীবন সহজ আন্তরিকতাপূর্ণ গীতিচ্ছন্দে রূপ পাইয়াছে।

৫

বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতা

কবিতা প্রধানতঃ দুই প্রকার— আত্ম-নিষ্ঠ বা মন্ময় কবিতা এবং বস্তু-নিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতা, এই কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বস্তু-নিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতাকে আবার যে কয়েকটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে তাহা নিম্নে আলোচিত হইল।

(১) গাথাকবিতা

• Ballad শব্দটী ফরাসী *Baller* (নৃত্য) শব্দ হইতে আসিয়াছে। প্রাচীন কালে নৃত্য সহযোগে যে-কবিতা গীত হইত, তাহাকেই গাথাকবিতা বলা হইত। অধুনা, গাথা বলিতে আমরা কোন লোকপ্রিয় পল্লীগান অথবা ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানের সমালোচনামূলক সহজ, সাবলীল, লঘুগতি কবিতাকে বুঝিয়া থাকি। পল্লীসঙ্গীতে বহু অজ্ঞাত লোকের রচিত বা মুখে মুখে প্রচলিত এই জাতীয় কবিতা পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের মধ্যযুগীয় *Robin Hood*-সংক্রান্ত গাথা কবিতা, Percy-র *Reliques* নামক কবিতা-সংগ্রহ (১৭৬৫) এবং বাংলায় 'ময়মনসিংহ গীতিকা', 'গোপীচাঁদের গান' এই শ্রেণীর কবিতা।• গাথাকবিতা অধিকাংশ স্থলেই এক বা বহু জনের রচিত হইতে পারে। প্রাচীন গাথা সাহিত্যে এত প্রক্ষিপ্ত রচনা আছে যে, উহাদের সুনিশ্চিত লেখক-পরিচয় সহজে জানা যায় না।

বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতা

সত্যকার সাহিত্যিক গাথা (*Literary Ballads*) বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার মধ্যে আখ্যান-ভাগ বা বিশেষ একটী ঘটনাংশ (ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা নহে) থাকিবেই। গল্পের কাহিনী সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশ করাই কবির প্রধান কাজ। গল্পাংশ বর্ণনায় নাটকীয় সংস্থান-সৃষ্টি বিশেষ প্রয়োজনীয়। গাথাকবিতা বস্তু-নিষ্ঠ বলিয়া ইহাতে লেখকের আত্মগত ভাব-কল্পনা অপেক্ষা জনগণ-নিষ্ঠ ভাব-কল্পনার প্রাধান্য অধিক। সুতরাং ইহাকে খাঁটী গীতিকবিতাধর্ম্মী মনে করা যাইতে পারে না।* অনেক সময় গাথায় বীরোচিত কাহিনী-সংস্থান বা অতি-প্রাকৃত সমাবেশ থাকিতে পারে; কিন্তু ইহাতে কোন উপদেশ বাণী বা রূপ-সজ্জার প্রয়োজন নাই। স্বকীয় নিরাভরণ আভরণ-গৌরবে ও সর্ব্বাঙ্গীণ স্বচ্ছ-সহজতায় ইহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। কোন কোন গাথাকবিতায় দুই চারিটী ছত্রের পুনরাবৃত্তি দ্বারা যে 'ধুয়া' (*Burden* বা *Refrain*) সৃষ্টি করা হয়, তাহা কবিতার আখ্যান ভাগটীকে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে অনলসভাবে জাগ্রত করিয়া রাখে।

গাথাকবিতা অনুকরণে আধুনিক সাহিত্যেও কয়েকটী উৎকৃষ্ট কবিতা রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইংরাজীতে Keats-এর *La Belle Dame Sans Merci*, এবং বাংলায় রবীন্দ্রনাথের 'স্পর্শমণি', 'পণরক্ষা', সত্যেন দত্তের 'ইন্‌সাফ্', কুমুদ মল্লিকের 'চণ্ডালিনী' উল্লেখযোগ্য।

(২) মহাকাব্য

মহাকাব্য তন্ময় কাব্য। ইহা ব্যক্তি-নিষ্ঠ নহে, বস্তু-নিষ্ঠ; লেখকের আন্তর অনুভূতির প্রকাশ নহে, বস্তু-প্রধান ঘটনা-বিন্যাসের প্রকাশ; গীতিকাব্যোচিত বাঁশির রাগিনী নহে, যুদ্ধসজ্জার তুর্য্য-নিনাদ। এতদ্ব্যতীত, ইহা মহাকায়, মহিমোজ্জ্বল, ব্যাপক হিমাদ্রি-কান্তির মত ধীর, গম্ভীর, প্রশান্ত, সমুন্নত ও মহত্ত্বব্যঞ্জক। এই কাব্যে কবির আত্মবাণী অপেক্ষা বিষয়-বাণী ও বিষয়-বিন্যাসই আমাদের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

---

* *Cf* — 'The first and foremost quality about Ballad is not its personality, but its impersonality.'— *F. Sidgwick. The Ballad.*

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদেব মতে আশীর্ব্বচন, নমস্ক্রিয়া অথবা বস্তু-নির্দ্দেশ দ্বাবা কাব্যারম্ভ হয়। মহাকাব্যের আখ্যান-বস্তু পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক, ‡ এবং নায়ক † ধীবোদাত্তগুণসমন্বিত অর্থাৎ সমস্ত সদ্‌গুণের সমষ্টিভূত, সর্গ-সংখ্যা অষ্টাধিক এবং পটভূমি স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল প্রসারী। ইহাতে শৃঙ্গার, বীব, করুণ ও শান্ত এই চাবিটীব একটী বস মুখ্য বা প্রধান এবং অন্যান্য বস ইহাদেব অঙ্গস্বরূপ হইবে। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে বিভিন্ন ছন্দে প্রকৃতি, যুদ্ধবিগ্রহ স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতাল প্রভৃতিব বর্ণনাও থাকিতে পাবে। ইহাব ভাষা ওজস্বী ও গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক হইবে। নাযকেব জয় বা আত্ম-প্রতিষ্ঠাব মধ্যে মহাকাব্যেব সমাপ্তি হইবে—কারণ সাধারণতঃ ইহাতে ট্র্যাজিডির স্থান নাই।

পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যেও ইহাদেব অনেকগুলি লক্ষণই বর্ত্তমান। Aristotle বলেন যে, মহাকাব্য আদি, মধ্য ও অন্তসমন্বিত বর্ণনাত্মক কাব্য—ইহাতে বিশিষ্ট কোন নাযকেব জীবন-কাহিনী অখণ্ডরূপে একই ছন্দেব সাহায্যে কীর্ত্তিত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্য আলোচনা কবিলে বুঝা যায় যে, ইহা সাধাবণতঃ বস্তু-নিষ্ঠ, আদি-মধ্য-অন্ত-সমন্বিত বর্ণনাত্মক কাব্য; ইহাব বস্তু-উপাদান জাতীয়-জীবনেব ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক তথ্য, ইহাব অনুপ্রেরণা অধিকাংশ সময়ই ঐশীশক্তি; ইহাতে মানব, দানব ও দেবদেবীব চরিত্রেব সমাবেশ ও প্রয়োজনবোধে অতিলৌকিক স্পর্শও থাকিতে পারে। মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি সকল সময়ই শুভান্তিক হইবে এমন কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই। ইহাতে জটিল ঘটনাবর্ত্তেব সৃষ্টি এবং বহুবিধ চরিত্র-সন্নিবেশ থাকিলেও সমগ্র কাব্যটিতে একটী অখণ্ড শিল্প-সঙ্গত সৌন্দর্য্য-বোধ ও মহত্ত্বব্যঞ্জক গাম্ভীর্য্য থাকিবে। ইহাব ভাষা প্রসাদগুণসম্পন্ন, ওজস্বী ও অনুপ্রাস উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার-বহুল। সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শ অনুসরণে আমরা মহাকাব্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিতে

‡ ইতিহাসোদ্ভবংবৃত্ত মন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্—বিশ্বনাথ।

† কখনো কখনো এক বা একাধিক নাযকও থাকিতে পারে।

পারি যে, নানা সর্গে বা পবিচ্ছেদে বিভক্ত যে ভগবৎ-প্রেরণা-অনুপ্রাণিত কাব্যে কোন সুমহান বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া এক বা বহু বীবোচিত চরিত্র অথবা অতিলৌকিক-শক্তি-সম্পাদিত কোন নিয়তি-নির্দ্ধারিত-ঘটনা ওজস্বী ছন্দে বর্ণিত হয়, তাহাকে **মহাকাব্য** বলে।

মহাকাব্যের ইতিহাস অনুসন্ধান কবিলে দেখা যায় যে, অনেক সময় কোন একখানা মহাকাব্যেব রচয়িতা সম্বন্ধে নিশ্চিত কবিয়া জানা যায় না। কারণ ইহারা 'একলা কবিব কথা' নহে। যুগে যুগে বিভিন্ন অজ্ঞাতনামা লেখকের হাতে পডিয়া কাব্যের মূল বিষযটী বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠিয়াছে, অথবা বিভিন্ন চবিত্র অবলম্বনে বিভিন্ন লোকের লেখা একত্র সংগ্রথিত হইযা মহাকাব্য বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বদেশের হৃদপদ্ম-সম্ভব এই শ্রেণীব কাব্য যেন 'বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতল-জঠব হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়-চ্ছায়া দান কবিযাছে'। এই শ্রেণীর মহাকাব্যকে *Epic of Growth* নামে অভিহিত করা হয়। মহাভাবত, *The Iliad, Beowulf* এই শ্রেণীব মহাকাব্য। বলা বাহুল্য যে, বিভিন্ন লোকেব বচিত এই শ্রেণীব মহাকাব্যেব মধ্যেও জাতিব সহস্র বৎসবের হৃৎপিণ্ডেব স্পন্দন অনুভূত হয়।

কিন্তু একজন গ্রন্থকারেব লিখিত যে মহাকাব্যে কোন জাতিব সর্ব্বলোকেব সাধনা আরাধনা ও সঙ্কল্প কোন পবম গুণান্বিত নায়কেব মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া ওঠে, এবং জাতি-হৃদয়েব দর্পণরূপে আমাদেব সম্মুখে উপস্থাপিত হয, তাহাকেই আমবা সত্যকাব মহাকাব্য বা *Literary Epic* বলিয়া গ্রহণ কবি। এই শ্রেণীর মহাকাব্য পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর মত স্ফীতকায, অসংহত ও অসমঞ্জস কলেবর-মাহাত্ম্যে আমাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেনা ; ইহাব আখ্যানবস্তু, চবিত্র-সৃষ্টি, ভাষা প্রভৃতি মিলিযা একটী অখণ্ড মহিমময় রস-মূর্ত্তি সৃষ্ট হয, এবং ইহাব শিল্প-চাতুর্য্য লেখকের দুবারোহী কল্পনা ও অনন্যসাধারণ মননশক্তি গুণে আমাদের নিকট চিরন্তন হইযা থাকে। এই জাতীয় কাব্যাদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'কালে কালে একটী সমগ্র জাতি যে কাব্যকে একজন কবির কবিত্বশক্তি আশ্রয় করিযা বচনা করিযা তুলিয়াছে, তাহাকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যায'

৬—

এই জাতীয় মহাকাব্য পুরাতন কথা-বস্তুর গ্রন্থন-মূলক সৃষ্টি নহে—পুরাতনীকে উপলক্ষ্য করিয়া সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। অতীত কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্যকার স্বকীয় যুগের যুগন্ধর কবি রূপে ইহাতে জাতির সুপ্ত-চেতনা ও জীবন-দর্শিকার মানবিক ভাব-মূর্তি দান করেন। ইহাতে রূপকের ব্যঞ্জনা অপেক্ষা কাব্যকারের জীবন-জিজ্ঞাসাই বেশি প্রস্ফুট। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 'মেঘনাদবধ কাব্য' মহাকাব্যের আকারে বাঙ্গালী-জীবনের গীতিকাব্য হইয়া উঠিয়াছে।

এই শ্রেণীর মহাকাব্যের মধ্যে Vergil-এর *Æneid*, Tasso-র *Jerusalem Delivered*, Dante-র *Divina Commedia*, Milton-এর *Paradise Lost*, Hardy-র *The Dynasts* ও মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' উল্লেখযোগ্য।

মহাকাব্যের যে আলোচনা করিয়াছি, অতঃপর ট্র্যাজিডির সহিত ইহার সম্বন্ধনির্ণয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহাকাব্য শুভান্তিক বা বিষাদাত্মক উভয়ই হইতে পারে, কিন্তু ট্র্যাজিডি বিষদাত্মক হইবেই। ট্র্যাজিডির নায়ক নিয়তির সহিত দ্বন্দ্বে পর্যুদস্ত হইলেও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়, কিন্তু মহাকাব্যের নায়ক নিয়তি বা বিধির নিকট ক্রীড়নক মাত্র। মহাকাব্য অল্পসংখ্যক শিক্ষিতজনের চিত্তবিনোদন করে, ট্র্যাজিডি অধিকতর জনের হৃদয় আকর্ষণ করে। মহাকাব্য পাঠ্য-কাব্য, ট্রাজিডি দৃশ্য ও পাঠ্যকাব্যের সমন্বয়; মহাকাব্যের বিপুলতা ও গৌরব মানুষকে সুমহান আলেখ্য দেখাইয়া বিস্মিত করে, ট্র্যাজিডির বিপুলতা তাহাকে দ্রবীভূত করে। মহাকাব্য শ্লথ-গতি ঐরাবত, ট্র্যাজিডি বেদনা-বিদ্যুৎগতি উচ্চৈঃশ্রবা; মহাকাব্যের গৌরব তাহার শাখায়িত বিস্তারে ও স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতাল-প্রসারী কল্পনায়, ট্র্যাজিডির গৌরব তাহার সংহত সুসীম সঙ্কোচনে এবং জগৎ ও জীবনের অতলস্পর্শ রহস্য-উদ্ঘাটনে। মহাকাব্য একই ওজস্বী ছন্দে ঐশ্বর্য্যশালী, ট্র্যাজিডি বহুবিচিত্র ছন্দ-শিহরণে রোমাঞ্চময়ী, মহাকাব্য বিচিত্র শোভাযাত্রা, ট্র্যাজিডি বেদনার মণ্ডলায়িত শতদল।

ট্র্যাজিডি ও মহাকাব্য

বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতা

মহাকাব্যে যাহা আছে, ট্র্যাজিডিতেও তাহা আছে, কিন্তু ট্র্যাজিডিতে যাহা আছে, মহাকাব্যে তাহা নাই। এইখানেই ট্র্যাজিডির অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব।

আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচিত হইতেছে না। ইংরেজীতে তবু Thomas Hardy *The Dynasts* নামক মহাকাব্য লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে মহাকাব্যের এই অসদ্ভাবের বিশেষ কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। আধুনিক যুগ গণ-তন্ত্রের যুগ। এই যুগে মানুষ সাধারণতঃ ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মর্ত্ত-বিগ্রহ প্রত্যক্ষ করিতে চায় না। প্রাচীন যুগের মানুষ সশ্রদ্ধ ও সবিস্ময় দৃষ্টিতে কোন মহাপুরুষকে অসাধারণ বলিয়া পূজা করিতে পারিত, আধুনিক কালের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধসম্পন্ন মানুষ তেমনটী পারে না। প্রাচীনযুগের বীরপূজা-স্পৃহা এখন বিচিত্র আত্ম-স্তুতিতে, পর্য্যবসিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমান যুগের ব্যক্তি-নিষ্ঠ কাব্যের দিনে মহাকাব্য অপেক্ষা গীতিকাব্যের মধ্যেই মানুষের অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা অধিকতর রূপে প্রকাশ পাইতেছে। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় ব্যক্তি-নিষ্ঠতাই মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যকে' গীতিকাব্যোচিত সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, আধুনিক যুগ-চিত্তের সংক্ষিপ্ত ও রসঘন আনন্দবেদনাকে রূপ দান করিবার সামর্থ্য মহাকাব্যের নাই। কারণ, আধুনিক যুগ, দ্রুত অধ্যয়নের যুগ, আধুনিক কালে মানুষের জীবনে অবসর অতি অল্প এবং এই স্বল্প অবসর সময়ের উপযোগিতা মহাকাব্যে নাই। চতুর্থতঃ, বর্ত্তমান যুগে উপন্যাস সাহিত্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। মহাকাব্যে গল্পাংশের যে উন্মাদনা ছিল, তাহা উপন্যাস প্রভৃতি পাঠেই এখন নিরসন হয়। সুতরাং গদ্য-সাহিত্যও মহাকাব্যের আবির্ভাব অসম্ভব করিয়া তুলিতে আংশিক ভাবে সাহায্য করিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে মহাকাব্যের অভাব কেন ?

কোন লঘু বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিবার জন্য সর্ব্ববিষয়ে মহাকাব্য লক্ষণাক্রান্ত যে কাব্য লিখিত হয়, তাহাকে *Mock*

Mock Epic

Epic বা বিদ্রূপাত্মক মহাকাব্য বলে। Pope-এর *The Rape of the Lock* নামক কাব্য Miss Arabella Fermor নাম্নী কোন মহিলার কেশ-কর্ত্তনের কাহিনী অবলম্বনে মহাকাব্যোচিত করিয়া লিখিত বলিয়া *Mock Epic* নামে খ্যাত। বাংলায় জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুছুন্দরী-বধ' কাব্যকে (১৮৬৮) এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে।

নীতিকবিতায় গল্প, কাহিনী বা নিছক কলা-শিল্পের সাহায্যে কবি জ্ঞান-গর্ভ নীতিকথা বা তত্ত্ব প্রচার করেন। যাহাতে নীতিকথার

(৩) নীতিকবিতা

তীব্রতা কল্পনার স্পর্শে কোমল ও কান্তরূপ পরিগ্রহ করে, তাহাই কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ জ্ঞানের কথা, নীতির কথা বা তত্ত্বকথাকে কবিত্ব-সুষমায় মণ্ডিত করিতে না পারিলে এই জাতীয় কবিতা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। Pope-এর *Essay on Criticism*, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব শতক', বঙ্গলালের 'নীতিকুসুমাঞ্জলি' প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

যে কবিতায় কোন গল্প বা কাহিনীর মধ্য দিয়া অন্য কোন বিশেষ অর্থের ব্যঞ্জনা করা হয়, তাহাকে আমরা *Allegory* বা রূপক-কবিতা

(৪) রূপক কবিতা

বলি। ইংরেজী সাহিত্যে Clough-এর '*Where lies the land*', মধুসূদনের 'যশের মন্দির' প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। ইংরেজী সাহিত্যে রূপক কবিতা ধর্ম্মমূলক, রাষ্ট্র-নৈতিক এবং সামাজিক— এই কয়েক প্রকার দৃষ্ট হয়।

Satire শব্দটী ল্যাটিন *satura lanx* নামক শব্দ হইতে উৎপন্ন। প্রাচীনকালে গ্রীস দেশে *satura lanx* নামধেয় একটী থালায় বর্ষারম্ভের

(৫) ব্যঙ্গকবিতা

সদ্যাগত ফল শস্য পূর্ণ করিয়া নৈবেদ্য সাজাইয়া গ্রীক দেবী Ceres-এর পূজা করা হইত। ইহা হইতে গদ্যপদ্য-সমন্বিত ও তীব্র শ্লেষাত্মক কবিতাকে *Satire* বলিয়া অভিহিত করা হয়। পরবর্ত্তী যুগে মানবচরিত্র, আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি সংশোধনের উদ্দেশ্যে যে নীতিকবিতা লিখিত হইয়া আসিতেছে তাহাকেই

Satire বা ব্যঙ্গ-কবিতা বলা হয়। লোকশিক্ষা, লোকচরিত্র সংশোধন ও সমাজের দুর্নীতি স্খালনের জন্য এই জাতীয় কবিতা উৎকৃষ্ট চাবুক। ইংরেজী সাহিত্যে Dryden-এর *Mac Flecknoe*, Pope-এর *The Dunciad*, বাংলায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হেমচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথের অনেক কবিতা, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত উদ্ধার' (১৮৭৭) এবং রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট্' ও 'দুরন্ত আশা' এই শ্রেণীভুক্ত।

কোন কবির কবিতাকে বিদ্রূপ করিয়া তাঁহারই অনুকরণে অতিরঞ্জিত করিয়া যে জাতীয় ব্যঙ্গ-কবিতা লিখিত হয়, তাহাকে ইংরাজীতে *Parody* বলে। সত্যকার প্যারডি-কবিতা মূল কবিতার বিচক্ষণ সমালোচনামূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইংরেজীতে James এবং Horace Smith, Owen Seaman, বাংলায় দ্বিজেন্দ্রলাল এবং সজনীকান্ত দাসের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রোমীয় লেখক Horace-এর অনুকরণে লিপি-কবিতার প্রথম সৃষ্টি হয়। এই জাতীয় কবিতায় সাধারণতঃ কোন অনুপস্থিত ব্যক্তি-

(৬) লিপি-কবিতা

বিশেষকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি কোন নীতিকথা, আলোচনা, প্রেম বা অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে কবিতা রচনা করেন। এই লিপি-কবিতায় যুগচিত্তের পরিকল্পনায় যে সকল নরনারী ভিড় করিয়া আসে, তাহাদের চরিত্র-সৃষ্টিতে কবির দক্ষতা একান্ত প্রয়োজনীয়। ইংরেজী সাহিত্যে Pope-এর *Eloisa to Abelard*, এবং বাংলায় মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' লিপি-কবিতার মধ্য দিয়া প্রেমের যে বহুবিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ।

এতদ্ব্যতীত, ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণে বাংলায় কয়েক প্রকার কবিতা লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ—
(ক) নাটকীয় স্বগতোক্তি

যে-কবিতায় কোন চরিত্র তাহার জীবনের কোন সঙ্কট মুহূর্ত্তে এক বা একাধিক শ্রোতার নিকট আত্ম-বিবৃতির মধ্য দিয়া নিজের মনের গভীরতম কথাটী প্রকাশ করে, তাহাকে নাটকীয় স্বগতোক্তি বা *Dramatic*

Monologue বলে। *Soliloquy* বা আত্মভাষণ এবং *Meditation* বা আত্মধ্যানমূলক কবিতার সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, এই জাতীয় কবিতায় যে ঘটনা-সংস্থান সৃষ্টি করা হয়, তাহাতে এক বা একাধিক শ্রোতার অদৃশ্য উপস্থিতি আমরা মোটেই সন্দেহ করি না। এই অদৃশ্য শ্রোতাই নানারূপ প্রশ্ন ও ইঙ্গিতের সাহায্যে বক্তার বক্তব্য বিষয়ের পরিপূর্ণ প্রকাশের ও চরিত্র পরিস্ফুটনের সাহায্য করে। ব্রাউনিং-এর *Andrea del Sarto*, *My Last Duchess*, রবীন্দ্রনাথের 'ত্যাগ', 'শুভক্ষণ', যতীন্দ্র বাগচীর 'চাষার ঘরে' এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(খ) নাট্যগীতি কবিতা

গীতিকবিতা নাট্যগুণ সমন্বিত হইলে তাহাকে নাট্যগীতি কবিতা (*Dramatic Lyric*) বলা হয়। এই শ্রেণীর গীতিকবিতায় কবি কোন নাটকীয় ঘটনা-সংস্থান (Situation) কাল্পনিক, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক চরিত্র-চিত্রের সাহায্যে পরিস্ফুট করেন। সুতরাং ইহাতে তন্ময়তা ও মন্ময়তার রাখী-বন্ধন হইয়াছে। দুই বা ততোধিক চরিত্রের কথাবার্তাকে এই শ্রেণীর কবিতায় নাট্যরূপ দেওয়া হয় বলিয়া ইহাকে **'সংবাদ কবিতা'**ও বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', মোহিতলালের 'মৃত্যু ও নচিকেতা' এবং যতীন্দ্র বাগচীর 'শবরীর প্রতীক্ষা' নামক কবিতা এই শ্রেণীভুক্ত।

(গ) *Triolet*

ফরাসী সাহিত্যের অনুকরণে ইংরেজী সাহিত্যে সনেটের সগোত্র কয়েক প্রকার অভিনব কবিতার আমদানী হইয়াছিল। তন্মধ্যে *Triolet*, *Rondeau*, *Rondel*, *Villanelle* প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে *Triolet*-ই বাংলা কবিতায় সচরাচর দেখা যায়। *Triolet* বা তেপাটি কবিতায় আটটী পংক্তি থাকে। ইহার ছন্দ-রীতি *ABaAabAB*. উদাহরণ স্বরূপ Austin Dobson ও বীরবলের কবিতা পাশাপাশি প্রদত্ত হইল—

Rose kissed me to-day	ঊষা আসে অচল শিখরে
Will she kiss me to-morrow ?	তুষারেতে রাখিয়া চরণ।

Let it be as it may,
Rose kissed me to-day,
But the pleasure gives way
To a savour of sorrow ;
Rose kissed me to-day
Will she kiss me to-morrow ?

স্পর্শে তার ভুবন শিহরে,
উষা হাসে অচল-শিখরে
ধরে বুকে নীহারে শীকরে
সে হাসির কনক বরণ।
বসো সখি মনের শিখরে।
হিম-বুকে রাখিয়া চরণ।

৬

নাটক

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নাট্যসাহিত্যকে কাব্য সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কাব্য দুই প্রকার—দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্য কাব্য।

নাটক কাহাকে বলে

নাটক প্রধানতঃ দৃশ্য কাব্য এবং ইহা সকল প্রকার কাব্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ—কাব্যেষু নাটকং রম্যম্। নাটক দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যের সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে গতিমান মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি আমাদের সম্মুখে মূর্ত্ত করিয়া তোলে।* রঙ্গমঞ্চের সাহায্য ব্যতীত নাটকীয় বিষয় পরিস্ফুট হয় না। নাট্যোল্লিখিত কুশীলবগণ তাহাদের অভিনয়-নৈপুণ্যে নাটকের কঙ্কালদেহে প্রাণসঞ্চার করেন, তাহাকে বাস্তব রূপৈশ্বর্য্য দান করেন। নাটকে অনেক সময় পাত্রপাত্রীদের কথায় নাট্যকার নিজের ধ্যানধারণার কথাও সংযোগ করিয়া দেন। এইজন্য ইহা সম্পূর্ণরূপে বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় (Objective) না-ও হইতে পারে। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার নিজেকে যথাসাধ্য গোপনে রাখেন এবং তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ একটা নির্লিপ্ততা (Detachment) বর্ত্তমান থাকে। যে-নাটকে এই জিনিষটীর অভাব, তাহা নিম্ন শ্রেণীর নাটক

* Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre.—*Elizabeth Drew* *Discovering Drama*

হইতে বাধ্য, কারণ নাট্যকার তখন নাট্যোল্লিখিত কুশীলবকে তাঁহার নিজের ভাব-কল্পনার বাহন করিয়া তোলেন। ফলে, উহা অত্যুগ্ররূপে প্রচারমূলক নাটক হইয়া দাঁড়ায়।

সংস্কৃত নাটক

প্রথম সংস্কৃত নাটক ভরত মুনি কর্তৃক রচিত। সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ পূর্ব্বরঙ্গ (*Prelude*) বা মঙ্গলাচরণ, দ্বিতীয়তঃ সভাপূজা (সামাজিকগণের), তৃতীয়তঃ কবি-সংজ্ঞা বা নাটকীয় বিষয় কথন, এবং তাহার পর প্রস্তাবনা। 'মঙ্গলাচরণে' সূত্রধার (ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতজ্ঞ ও অভিনয়পটু) রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া অভিনয় কার্য্যের বিঘ্ন-পরিসমাপ্তির জন্য যে মঙ্গলাচারণ করেন তাহার নাম 'নান্দী'। প্রস্তাবনার পর সাধারণতঃ প্রথম অঙ্ক আরম্ভ হয়। নাটকীয় কুশীলবগণ 'সূচিত' না হইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে পারে না। শুধু নায়ক বা আর্ত্ত যে-কোন চরিত্রের প্রবেশের জন্য সূচনার প্রযোজন নাই। নাটকের ভাষায় গদ্য ও পদ্য উভয়ই ব্যবহৃত হয়। তবে, সংস্কৃত নাটকে বিদ্বানপুরুষ সাধারণতঃ সংস্কৃত, বিদুষী মহিলাগণ শৌরসেনী, রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠীগণ অদ্ধমাগধী, বিদূষক প্রাচ্য এবং ধূর্ত্ত অবন্তিক ভাষা ব্যবহার করিতেন। নাটকের plot বা বিষয় বস্তু খ্যাতবৃত্ত অর্থাৎ প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত বা রামায়ণ মহাভারতাদি হইতে গৃহীত, কবি-কল্পিত, অথবা মিশ্রিতও হইতে পারে। নায়ক ধীরোদাত্ত, ধীরললিত ধীরপ্রশান্ত, ধীরোদ্ধত—এই চার শ্রেণীর হইতে পারে। স্বভাবতঃ, নায়ক দানশীল, কৃতি, রূপবান, কার্য্যকুশল লোকরঞ্জক, তেজস্বী, পণ্ডিত ও সুশীল হইবে। নাটকে অঙ্গী বা প্রধান রস শৃঙ্গার বা বীর, কখনো বা শান্তও হইতে পারে। অন্যান্য রস অপ্রধান ভাবে থাকিবে—ইহাতে করুণ রস থাকিলেও বিয়োগান্ত 'রূপকের' * স্থান নাই। নাটকে পাঁচ হইতে দশটী পর্য্যন্ত অঙ্ক থাকিতে পারে। এই সকল অঙ্কমধ্যে গর্ভাঙ্ক থাকিতে পারে। নাটক দৃশ্যকাব্য বলিয়া ইহা অভিনেয় অর্থাৎ অভিনয় করিবা

* নট অন্যের রূপ ধারণ করিয়া অভিনয় করে বলিয়া নাটকের নাম রূপক।

ইহা সামাজিকগণকে দেখাইতে হয। নাটকীয় বিষয়-বস্তুর অবস্থানুরূপ অনুকরণের নাম **অভিনয়**। এই অভিনয সাধারণতঃ চার প্রকারের — আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক। অঙ্গদ্বারা নিষ্পন্ন অভিনয়কে আঙ্গিক, বচন দ্বারা নিষ্পন্ন অভিনযকে বাচিক বলে। আহার্য্যাভিনযের অর্থ নেপথ্য-বিধান বা বেশ-রচনা। অভিনযের দ্বারা সত্ত্বাদিভাবের উদ্রেকে কম্পস্বেদাদি হইলে তাহাকে সাত্ত্বিক অভিনয কহে।

Classical ও Romantic নাটক

Classical ও Romantic নাটকের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। Classical নাটক প্রাচীন গ্রীক বা রোমীয নাটকের অনুকরণে লিখিত। ইহাদের মধ্যে মানবজীবনের কাহিনী সংহত ও সংযত রূপে প্রতিফলিত হয। ইহাতে নাট্যকার কযেকটী মাত্র দৃশ্য অবতারণা করেন এবং অপ্রযোজনীয বা মূল নাট্য বিষয়-বস্তুর প্রতিকূল ঘটনাবলী সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিযা মুখ্য বিষয়ের পুষ্টিসাধনে রত থাকেন। কিন্তু রোমান্টিক নাট্যকার তাঁহার স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনার সাহায্যে জীবনের পরিপূর্ণ দিকটী অবন্ধন ভাবে, প্রযোজন হইলে, আপাতঃ-বিরোধী বিষয় বস্তুর অবতারণায, নাটকে প্রমূর্ত্ত করিযা তোলেন। প্রথমোক্ত নাট্যকারদের মত তাঁহারা নাটকীয ঐক্যনীতি মানিযা চলেন না এবং স্বাধীনভাবে নাটকীয় চরিত্র বা ঘটনা-সন্নিবেশ করেন। ক্ল্যাসিকেল নাটক এক সুরের নাটক, ইহাতে কোন মিশ্রণ নাই অর্থাৎ ক্ল্যাসিকেল ট্র্যাজিডিতে কোন হর্ষাত্মক বা ক্ল্যাসিকেল কমেডিতে কোন বিষাদাত্মক আখ্যান-বস্তুর অবতারণা থাকে না। রোমান্টিক নাটকে উভযের মিশ্রণের সাহায্যেই নাটকের মূল বিষয় পরিস্ফুট করা হয়। রোমান্টিক নাটকে চরিত্রগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ সহজতর হইযা উঠে, এবং নাট্যকার স্থান ও কালের বন্ধন অতিক্রম করিযা পাঠককে মানবজীবনের অবাধ এবং স্বাভাবিক লীলা-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ করেন। ক্ল্যাসিকেল নাট্যকার বিশেষ কোন একটী স্থান ও সময়ের মধ্যে মানব-ভাগ্যকে সংহত করিয়া নাটকীয় কলা-কৌশলের সাহায্যে উহাতে দৈব বা ঘটনাপরম্পরার

৭—

অনিবার্য্য পরিণতিকে রূপ দান করেন। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের রীতি-পদ্ধতির সনাতনপন্থা বর্জ্জন করিয়া প্রথম রোমান্টিক বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেন। তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬০) বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিয়োগান্ত নাটক। এই নাটক লিখিবার পূর্ব্বে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন—

'If I should live to write any drama, you should rest assured, I shall not allow myself to be bound by the dicta of Viswanath of the Sahityadarpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models.'

নাটকীয় ঐক্যনীতি

Aristotle-এর দিন হইতে সনাতনপন্থী নাট্যকারগণ নাটকে তিনটী ঐক্যনীতি (*Unities*) মানিয়া চলিতেন। যথা—

(১) **সময়ের ঐক্য** (*Unity of Time*)—নাটকীয় আখ্যানভাগ রঙ্গমঞ্চে দেখাইতে যতক্ষণ সময় লাগে, বাস্তব জীবনে সংঘটিত হইতে যেন ঠিক ততক্ষণ লাগে এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। **Aristotle** এই কাল-নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ইহাকে **'single revolution of the sun'** অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন।

(২) **স্থানের ঐক্য** (*Unity of Place*)—নাটকে এমন কোন স্থানের উল্লেখ থাকিতে পারিবে না, যেখানে নাট্য-নির্দ্দেশিত সময়ের মধ্যে নাটকের কুশীলবগণ যাতায়াত করিতে পারে না।

(৩) **ঘটনার ঐক্য** (*Unity of Action*)—নাটকে এমন কোন দৃশ্য বা চরিত্র সমাবেশ থাকিবে না যাহাতে নাটকের মূল সুর ব্যাহত হইতে পারে। সুতরাং সমস্ত চরিত্র ও দৃশ্যই নাটকের মূল বিষয় ও সুরের পরিপোষক রূপে প্রদর্শিত হওয়া চাই এবং নাটকটী যেন আদি, মধ্য ও অন্ত সমন্বিত একটি অখণ্ড-সৃষ্টি রূপে পরিস্ফুট হয়।

বলা বাহুল্য, এই তিনটী ঐক্যনীতি পালন করিলে নাটকের স্বাভাবিকতা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ, এতগুলি বিধিনিষেধের মধ্যে মানবজীবনের স্বাধীন লীলা-প্রদর্শন সম্ভবপর হয় না। ইংরেজী

সাহিত্যে Ben Jonson ঐক্যনীতি মানিয়া চলিয়াছেন, এবং Shakespeare মাত্র *The Tempest* এবং *The Comedy of Errors*-এ এই নিয়ম মানিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই তিনি *Unity of Action* বা ঘটনার ঐক্য মানিয়া নাটকের মূল-বিষয় পরিস্ফুট করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নাটকের বৈচিত্র্য ও সজীবতা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে।

নাটকের প্রয়োজনীয় বিষয়

কোন নাটক পরিপূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে নাট্যকার, অভিনেতা, রঙ্গমঞ্চ ও সহৃদয় সামাজিক—এই কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। নাট্যকার ভাব-বস্তুকে প্রাণ দেয়, রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেতা তাহাকে রূপ দেয় ও সামাজিক তাহাকে গ্রহণ করে। নাট্য রচনাকালে প্রত্যেক নাট্যকারই নাটকীয় কথা-বস্তু বা *Plot*, নাটকীয় ঘটনাপারম্পর্য্য সৃষ্টি করিবার জন্য যথাবিহিত চরিত্র-সৃষ্টি (*Characterisation*), নাটকীয় কুশীলবগণের (*Dramatis Personae*), কথাবার্ত্তা (*Dialogue*), নাটকের স্থানীয় পরিবেশ-সৃষ্টি (*Local Colour*), বিশিষ্ট বচনাভঙ্গি এবং জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে স্বকীয় ধ্যান-ধারণার ইঙ্গিত প্রদান—প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত হইবেন। নাট্যকার রাশীকৃত তথ্যস্তূপ হইতে বিশেষভাবে গ্রহণ ও বর্জ্জনের দ্বারা একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু-উপাদান গ্রহণ করিবেন; এবং চরিত্র পরিস্ফুটনের জন্য তাহার পারম্পর্য্য ও সঙ্গতি রক্ষা করিবেন; নাটকীয় কথাবার্ত্তা কুশীলবগণের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে প্রোজ্জ্বল ও বিশিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং নাটকের স্থানীয় পরিবেশ যথাপ্রয়োজনীয় ভাবে কথাবার্ত্তায় ও অভিনয় নির্দ্দেশের (Stage directions) সাহায্যে সৃষ্টি করিতে হইবে। নাট্যকার তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রাবলী হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিয়া নাটকের বিষয়-বস্তুকে স্বাভাবিক পরিণতি দান করিতে চেষ্টা করিবেন। কোন আকস্মিক ঘটনা বা অসমঞ্জস চরিত্র-সৃষ্টি নাটকীয় অখণ্ড সৌন্দর্য্যকে যেন ক্ষুণ্ণ না করে। প্রয়োজনবোধে কখনো প্রতিরূপ বা অনুরূপ আখ্যান-বস্তু

(Parallelism) সংগ্রথিত করিয়া তিনি নাটকীয় বিষয়-বস্তুকে রস-ঘন করিতে পারেন। সর্ব্বোপরি, নাটকের কাব্য-সত্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই বিষয়ে তাঁহাকে সজাগ থাকিতে হইবে। Aristotle-এর ভাষায়—'The poet should prefer probable impossibilities to improbable possibilities.'

প্রত্যেক নাটকই সাধারণতঃ পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত। যথা—

(১) **প্রারম্ভ** (*Exposition*).

(২) **প্রবাহ** (*Growth of Action*).

(৩) **উৎকর্ষ** (*The Climax*).

(৪) **গ্রন্থি-মোচন** (*Falling Action* or *Resolution*)

(৫) **উপসংহার** (*Catastrophe* or *Conclusion*) *

প্রথম অঙ্কে বিষয়-বস্তুর সূচনা, দ্বিতীয় অঙ্কে ঘটনা সমূহের জটিলতা সৃষ্টি, তৃতীয় অঙ্কে নাটকীয় ঘটনার ঘনীভূত অবস্থা বা উৎকর্ষ, চতুর্থ অঙ্কে জটিলতা মুক্তি এবং পঞ্চমাঙ্কে সমাপ্তি।

নাটকের বিষয়-বস্তু ও তাহার পরিণতির দিক হইতে উহাকে প্রধানতঃ কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করা যায়:— বিয়োগান্ত নাটক (*Tragedy*), মিলনান্ত নাটক (*Comedy*) এবং প্রহসন (*Farce*)

নাটক : শ্রেণীবিভাগ

আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত বা অভিভূত মানবজীবনের করুণ কাহিনীকে সাধারণতঃ *Tragedy* বলা হয়। সেক্স্‌পীয়রের ট্র্যাজিডিতে কোন খ্যাতিমান, বিশিষ্ট ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পতন দেখান হয়। এই জাতীয় নাটকে নায়কের ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা ব সামান্য ভুল ভ্রান্তির জন্য জীবনে অনর্থ আসিয়া পড়ে, কখনো দৈব বা অদৃষ্টপীড়িত হইয়া তাহাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। নাট্যকার বিশেষ গুরুগম্ভীর বাণীভঙ্গিতে নায়কের জীবনের নিদারুণ বেদনাকে রূপ দান

ট্র্যাজিডি

* সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে নাটকীয় কাহিনীর মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ, নির্বহণ— এই পাঁচটী বিভাগের উল্লেখ আছে।

করেন। নায়ক গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকে; একদিকে তাঁহার আপনার সঙ্গে আপনার দ্বন্দ্ব, (*Internal Conflict*), অপরদিকে বাহিরের ঘটনাপুঞ্জের সহিত তাঁহার দ্বন্দ্ব (*External Conflict*)। এই দ্বিবিধ দ্বন্দ্ব মূলতঃ একই দ্বন্দ্বের দুইটী দিক। চারিত্রিক ব্যক্তি-স্বাধীনতা (*Freedom within*) ও আত্ম-নিরপেক্ষ নিয়তি-লীলার (*Necessity without*) দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বারবার পরাজিত হইয়াও যে শুধু *Will to power*-এ অনুপ্রাণিত হইয়া নায়ক আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহাই তাহাকে নায়ক-সুলভ বৃহৎ মর্য্যাদা দান করে। বঙ্কিমচন্দ্রও বলেন যে, 'অন্তঃপ্রকৃতির ঘাতপ্রতিঘাত চিত্রিত করাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য।' সুতরাং বঙ্গমঞ্চে নায়ক বা নায়িকার গতিমান জীবন-কাহিনীর দৃশ্যপরম্পরা উপস্থাপিত করতঃ দর্শকের হৃদয়ে উদ্রিক্ত ভীতি ও সহানুভূতি প্রশমন করিয়া তাহার মনে করুণ-রসের আনন্দ-সৃষ্টি করাই ট্র্যাজিডির চরম উদ্দেশ্য। এখন আমরা Aristotle-এর ভাষায় ট্র্যাজিডির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে পারি। তিনি বলেন—

'Tragedy is an *imitation* of an action that is *serious, complete,* and of a certain *magnitude*, in language *embellished* with each kind of artistic ornament, the *several kinds* being found in separate parts of the play; in the form of *action,* not of *narrative,* through pity and fear effecting the proper *purgation* of these emotions.

সেক্সপীয়রের বিয়োগান্ত নাটকে মৃত্যুই স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু আধুনিক যুগে মৃত্যুকেই সকল সময় পরিণতি রূপে গ্রহণ করা হয় না। কোন ব্যক্তি-বিশেষের জীবন ঘটনাচক্রে, গ্রহ-বৈগুণ্যে বা নিজের দোষে ব্যর্থ হইয়া গেলে, সেই ব্যর্থতার ইতিহাসটীই বিয়োগান্ত নাটকের উপজীব্য রূপে গ্রহণ করা হয়। আধুনিক যে নাটক এইভাবে দর্শকের মনে ব্যর্থতার বেদনা জাগাইয়া তোলে, তাহা ট্র্যাজিডি বলিয়া পরিগণিত। এইজন্য ইহাকে বিয়োগান্ত না বলিয়া **বিষাদাত্মক** নাটক বলাই অধিকতর সমীচীন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ট্র্যাজিডি আমাদিগকে আনন্দ দান করে। সংস্কৃত আলঙ্কারিক বলেন—

করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্॥ †

অর্থাৎ করুণ প্রভৃতি রস হইতেও যে শ্রেষ্ঠ সুখ উৎপন্ন হয়, সহৃদয়গণের অনুভূতিই তাহার প্রমাণ। Abercrombie বলেন—

Tragedy satisfies us even in the moment of distressing us. ‡

ট্র্যাজিডি আনন্দ দেয় কেন?

ট্র্যাজিডি মানবজীবনের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া সামাজিকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে এবং তাহার মন করুণা ও ভীতিতে পূর্ণ করিয়া দেয়। যখন আমরা দেখি যে, ব্যক্তিগত সামান্য কোন দোষে বা দৈবচক্রে একটী লোক ভীষণ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছে, তখন স্বভাবতঃই তাহার জন্য আমাদের মনে সহানুভূতির উৎপত্তি হয়। এই সহানুভূতি দুইটী কারণে আসিতে পারে—প্রথমতঃ, তাহার বিপদ দেখিয়া আমরা তাহার সঙ্গে সেই মুহূর্ত্তে একাত্ম হই, এবং মনে করি, এমন বিপদ আমাদের নিজের জীবনে সংঘটিত হইলে আমাদের পক্ষেও যে অসহনীয় হইয়া উঠিবে। এইরূপ আত্ম-চিন্তায় আমাদের মনে ভীতি উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের অবস্থা তাহার মত না হইলেও, সে-ও মানুষ, সুতরাং মানুষ হিসাবে তাহার জন্য আমাদের হৃদয়ে স্বাভাবিক করুণা সঞ্চার হয়; এবং আমরা তাহার বিপদে সহানুভূতি-সম্পন্ন হই। বিশেষতঃ, নাটক দেখিবার সময় আমরা আমাদের অজানিতে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া এতখানি তন্ময় হইয়া পড়ি যে, নায়ক বা নায়িকার ভাগ্য-লিপি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাগ্য-লিপি যেন নির্দ্ধারিত হইতেছে, এই সত্য-বোধই আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত হয়। তাহার ভুলের মধ্যে, আঘাতের মধ্যে, বেদনার মধ্যে আমরা আপনাকে পাই এবং মানব-জীবনের নিয়তি সম্বন্ধে সচেতন হই।

† সাহিত্যদর্পণ ‡ *The Idea of Great Poetry.*

এই ভাবে আত্ম-বিলুপ্তির * মধ্য দিয়া নাটক দর্শনকালে আমাদের যেন নবজন্ম হয়। এইজন্য নায়ক বা নায়িকার দুঃখ, বিপদ, হর্ষ, বিষাদ, প্রেম নৈরাশ্য, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতি আমাদেরই মনোভাব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বাড়ী হইতে নাটক দেখিতে যাইবার সময় আমরা অত্যন্ত সুস্থ মানুষটী ছিলাম— কিন্তু নাটক দেখিবার সময় নায়ক বা নায়িকার ভাবে তদ্গতচিত্ত হইয়া উঠি, তাহার দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করি, প্রেমের সাফল্যে উল্লসিত হই, নৈরাশ্যে নুইয়া পড়ি, ঈর্ষ্যায় ঈর্ষ্যান্বিত হই, ক্রোধে ক্রুদ্ধ হই, আনন্দে আত্ম-হারা হই। নাট্যকাব সুকৌশলে, কৃত্রিম উপায়ে, এই ভাবগুলি আমাদের মধ্যে উদ্রিক্ত করিয়া দিয়া ইহাদের আকস্মিক ও অত্যুগ্র আত্ম-প্রকাশ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। (কোন লোকের দেহে রক্তাধিক্য হইলে ডাক্তারগণ যেমন কিয়ৎ পরিমাণে রক্ত-মোক্ষণ করিয়া (*Purgation*) তাহাকে নিরাময় করেন, ট্র্যাজিডিও তেমন আমাদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বাসনা কামনা উদ্রেক করিয়া, আবাব উহাদের নিরসন কবতঃ আমাদের মানস-স্বাস্থ্যের সাম্যবিধান করেন।) কারণ, নাটক দেখিয়া আমরা অশ্রুধারার মধ্য দিয়া জীবনের যে রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিলাম, তাহাতে আমাদের মানসিক চিকিৎসা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—উদ্বৃত্ত বাসনারাশির প্রশমনে আমরা লঘু হইয়া উঠিয়াছি। অন্যের (নায়ক ও নায়িকা) বেদনার মধ্যে আমরা নিজেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অথচ বেদনাব আঘাতকে ব্যক্তিগত করিয়া পাই নাই, যেহেতু আমরা তখন সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত ছিলাম। নাট্যকার গভীর ভাবে আমাদের সুপ্ত বেদনা-সিন্ধু

---

* Aristotle-এর এই মত সম্বন্ধে Philo M. Buck বলেন যে, অধিকাংশ ট্র্যাজিডিতে দর্শকের আত্ম-বিলুপ্তি অপেক্ষা আর একটী মিশ্র (*Complex*) অভিজ্ঞতাই বড় হইয়া উঠে। নাটকীয় চরিত্রাবলীর বিকাশ-ব্যূহের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া, অথচ ইহাদের কাহারও সহিত ব্যক্তিগতভাবে সহানুভূতি না দেখাইয়া, শুধু সকলকে গ্রহণ করিয়া, আবার সকলের অভিজ্ঞতার অতীত হইয়া নাটকের পূর্ণতর অনুভূতি লাভ করাই দর্শকের পক্ষে বেশি স্বাভাবিক।

উদ্বেলিত করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে প্রশমিত করিলে, আমরা অশ্রু-বিধৌত হইয়া বর্ষণ-স্নাত শ্যাম প্রকৃতির মত শান্ত, সমাহিত ও কান্ত রূপ পরিগ্রহ করি। ট্র্যাজিডিতে এই মাধুর্য্য আছে বলিয়াই আমরা তাহা দেখিয়া কাঁদি, আবার বলি, 'ভাল লাগিল, আনন্দ পাইলাম।'

কৃত্রিম উপায়ে বাসনা কামনা উদ্রেক করিয়া আবার তাহাকে প্রশমিত করিবার এই যে নাটকীয় কলা-কৌশল— artistic subjugation of the awful— ইহাকে Aristotle-এর ভাষায় *Katharsis* বলে। এতদ্ব্যতীত, ট্র্যাজিডির আনন্দদায়িনী শক্তির কারণ আরও গভীর। ট্র্যাজিডিতে মানবজীবনের নিদারুণ ব্যর্থতা ও অক্ষমতার বাণী ফুটিয়া উঠে সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিডিতেই জীবনের প্রতি বিদ্বেষ বা বীতস্পৃহার পরিচয় নাই। ইহাতে মানুষ বাস্তবের সকল সংশয় মুক্ত হইয়া পরাজয় ও বেদনার একটী অপরূপ অর্থ-ব্যঞ্জনায় পরম আশ্বস্তি লাভ করে। গভীর দুঃখকে, ভূমাকে মানুষ 'হৃদামনীষা মনসা' স্বীকার করিয়া নেয়। কারণ, সাহিত্যের মধ্যেই মানুষ নিজেকে অপরের সহিত একাত্ম করিয়া দেখিবার শক্তি অর্জ্জন করে। বিশেষতঃ, ট্র্যাজিডিতে জীবনের যে একটী সমগ্র রূপসৃষ্টি হয়, তাহা বুদ্ধির অতীত, শুধু হৃদয়বেদ্য। বুদ্ধির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মানুষ আত্ম-দর্শনের গভীর চেতনায় যে-রূপের সাক্ষাৎ লাভ করে, তাহাতে তাহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়। মৃত্যু বা ব্যর্থতা যে-নাটকের পরিণতি, তাহার মধ্য দিয়া তাহার '*soul-making*' বা আত্মশুদ্ধি হইয়া গিয়াছে, বেদনা তাহাকে অগ্নি-বিশুদ্ধ স্বর্ণ-কান্তি দান করিয়া মহিমময় করিয়া তুলিয়াছে, তাই মর্ম্মান্তিক কাহিনীও তাহার কাছে মধুর হইয়া উঠে। এই অনুভূতির মধ্যে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বিস্ময়-মধুর অমৃতের আশ্বাস ও পরম প্রাপ্তির সান্ত্বনা-বাণী নিহিত। এইজন্যই জনৈক বিখ্যাত সমালোচক বলেন—

'The strange calm which succeeds the spectacle of tragic dissolution, comes not from a sense of defeat but from awe of the fulfilment.'†

† *Alexander Poetry and the Individual.*

কমেডি ও ট্র্যাজিডির বিভিন্নতা শ্রেণীগত নহে, মাত্রাগত। কমেডিতে সাধারণতঃ মানবজীবনেব হর্ষোদ্দীপক লঘুচিত্রটী অঙ্কিত হয়। ইহার নায়ক জীবনের উন্নতির পথে সর্ব্ববিধ বাধাবিঘ্ন অনায়াসে বা অল্পায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া সাফল্যের উচ্চগ্রামে উপনীত হয। ইহার পরিসমাপ্তি হাস্যমধুব ও আনন্দোজ্জ্বল।

কমেডি

শারদ আকাশের সীমাহীন নীলিমায় যে অপরূপ স্বচ্ছতা, বাসন্তী সৌন্দর্য্যে যে প্রগল্‌ভ কান্তি, আকাঙ্ক্ষিত জনের সহিত মিলন মুহূর্ত্তে প্রেম-মুকুলিতার অধরে যে হাস্যারুণ দীপ্তি, শ্রেষ্ঠ কমেডিব পবিসমাপ্তিতে সেই স্বচ্ছতা, সেই কান্তি, সেই দীপ্তি। (Aristotle বলেন, মানব চবিত্রের যে কৌতুকাবহ দিকটী পীডন করে না, ব্যথা দেয় না, হাস্যবস সৃষ্টি করে, তাহাই কমেডির উপজীব্য।) এই কৌতুকের জন্ম আবার ইচ্ছার সহিত অবস্থার, আকাঙ্ক্ষাব সহিত প্রাপ্তির, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়েব বা কথাব সহিত কার্য্যের অসঙ্গতিব মধ্যে। এইজন্যই একান্ত স্থূলবুদ্ধি যখন নিজেকে বুদ্ধিমান বলিযা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, অজ্ঞানী যখন জ্ঞানের স্পর্দ্ধা কবেন, কূটবুদ্ধি যখন সরলতার ভাণ কবেন, দুষ্প্রাপ্য বস্তু-মোহে কেহ যখন জলৌকার ন্যায় নিষ্ঠাব সহিত আত্মসমাহিত থাকেন, তখন আমাদেব হাসি পায়। সকল সময়ই যে এই হাসি নির্ব্বিষ হইবে এমন কথা নয়। এই হাসির মধ্যে পরপীডনেচ্ছা সামান্য পরিমাণে বিদ্যমান থাকিতে পাবে। কারণ, আপাতঃ-অসম্ভব হইলেও বেদনাও হ স্যবসের জন্মভূমি। অপবকে বেদনা দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার কামনাও মানুষের অতি সাধাবণ মনোবৃত্তি। এই পবপীডনেচ্ছা মাত্রা ছাডাইয়া গেলে, অপবের বেদনা দেখিয়া যিনি আত্মপ্রাসাদের হাসি হাসিতেছিলেন, তাহাব চক্ষুও অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, এবং যাহার দুর্দ্দশায় তিনি আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, তাহাব প্রতি তাহাব সহানুভূতি সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ অসঙ্গতিব আঘাত যখন মনেব অনতি-গভীর স্তর ছাডাইয়া গভীরতর স্তবে পৌঁছায, তখন হাসি অশ্রুতে পর্য্যবসিত হয়। (রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'কমেডি এবং ট্র্যাজিডি কেবল পীডনের মাত্রাভেদ।)

কমেডিতে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় তাহাতেও আমাদের হাসি পায় এবং ট্র্যাজিডিতে যতদূর পর্য্যন্ত যায় তাহাতে আমাদের চোখের জল আসে···।·····অসঙ্গতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।* সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, অসঙ্গতিবোধ ট্র্যাজিডি ও কমেডি উভয়েরই উপজীব্য হইতে পারে। Malvolio যখন Olivia-র প্রেম-স্বপ্নে আত্মবঞ্চনা করে, তখন আমাদের হাসি পায; কিন্তু কোন লোক জীবনের পরম অভিলষিতকে আজন্মকাল অনুসরণের পর হস্তগত করিয়া যখন দেখে সে তুচ্ছ প্রবঞ্চনা মাত্র, তখন তাহার নৈরাশ্যে আমাদের চিত্ত ব্যথিত হয়।

কমেডির উদ্দেশ্য

প্রাচীন গ্রীক ও ফরাসী কমেডিতে যে হাস্যরস সৃষ্টি করার চেষ্টা হইয়াছে তাহাও সমাজের বিদ্রূপ-কটাক্ষ-লাঞ্ছিত—*social gesture*—বলিয়া মনে হয়। শাস্ত্রসম্মত নাট্য রচনা করিতে গিয়া Ben Jonson তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির কোন বিশিষ্ট স্বভাব অতি-রঞ্জনের দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেন। Shakespeare-এর কমেডি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জীবনের অসঙ্গতিবোধকে তিনি যে ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কমেডি গণশিক্ষার বাহন হইয়া উঠে নাই; তাহার হাস্যরস যেন সুস্থ সমাজচেতনার উদার ক্ষমাসুন্দর হাসি। Meredith যাহাকে 'the spirit of commonsense in society, vigilant but kindly' বলেন, এই হাসি তাহা অপেক্ষাও সহৃদয়। কারণ এই হাস্যরসে দর্শকের অহমিকা বোধ থাকে না। হাস্যোদ্দীপক চরিত্রের সহিত অভিন্ন হইযা সামাজিকগণ ক্ষণতরে সমালোচকের আসন হইতে নামিয়া আসিয়া আত্মসাক্ষাৎকার করেন, নিজের দুর্ব্বলতার মধ্যে নিজেকে দর্শন করেন। এই জন্যই সেক্সপীয়রের Falstaff-কে আমরা বিচার করি না, দীনবন্ধুর নদেরচাঁদকেও প্রত্যাখ্যান করি না—আমাদের অন্তর্নিহিত

* রবীন্দ্রনাথ: পঞ্চভূত

Falstaff ও নদেবচাঁদের সহিত পরিচয় করিয়া ধন্য হই। অনেক সময় নায়কের ভুল ভ্রান্তি আমাদের মত (?) গুণান্বিত জনের জীবনে ঘটিতে পারে না, এইরূপ ভাবজনিত আত্মপ্রসন্ন চিত্তে আমরা বলি, 'বেশ হইয়াছে'। কিন্তু অপরের দুর্ব্বলতা বা স্থূলবুদ্ধি দর্শন করিয়া হাস্য করা অপেক্ষা ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা নায়কের চরিত্রে প্রতিফলিত দেখিয়া হাস্য করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। শ্রেষ্ঠ কমেডি আমাদের মধ্যে সেই হাসির উদ্রেক করিতে পারে। কারণ, ইহা আমাদের আত্মসাক্ষাৎ করাইয়া দেয়। ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা নায়কের চরিত্রে সন্দর্শন করিয়া আমরা সকলের অজানিতে আত্মসংশোধন করিবার সুযোগ পাই। সুতরাং ট্র্যাজিডি যেমন আমাদের উদ্বৃত্ত বাসনাকামনা প্রশমন করিয়া মানস-স্বাস্থ্য অটুট রাখে, কমেডিও তেমন আমাদের মানবসুলভ ক্রটীবিচ্যুতি ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিণাম অঙ্কন করিয়া আমাদিগকে অশোভন দুর্ব্বলতার হাত হইতে মুক্তি দান করিয়া স্বাভাবিক ও সুস্থ করিয়া তোলে।

কমেডি জীবনের কোন গভীর সমস্যাকে নাটকীয় উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করে না, শুধু জীবনের লঘুতর দিকটী উপস্থাপিত করে, ইহার অর্থ এই নয় যে, ইহাতে কোন জীবন-জিজ্ঞাসা নাই। আসল কথা এই, কমেডির জীবন-জিজ্ঞাসা মানুষকে কোন পরম রহস্য সন্ধানে নিয়োজিত করে না—বরং মানুষকে সর্ব্বপ্রকার অসঙ্গতির ঊর্দ্ধে লইয়া যায়। মানুষ এইখানে সজ্ঞানে সুস্থচিত্তে সানন্দে ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতাকে অতিক্রম করে। ট্র্যাজিডিতে মানুষ জীবনের ব্যর্থতার মধ্যে, নিরবধি কালের মধ্যে পরম শান্তি এবং সান্ত্বনা খুঁজিয়া পায়। কমেডিতে মানুষ এই পৃথিবীর মধ্যেই তাহার বিজয়-পতাকা উড্ডীন দেখিতে পায়। যে ঘটনাচক্র তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, তাহাকে নিষ্পেষিত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করা এবং 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরাকে' বীরের মত দেহমনপ্রাণ দিয়া ভোগ করাই তাহার বাসনা। পৃথিবীর এই সূর্য্যকর, এই পুষ্পিত কাননই তাহার কাম্যবস্তু। তাই সে বলে—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

কমেডিব আখ্যানভাগ অত্যন্ত উদ্ভট বা কল্পনাপ্রবণ হইলেও নাট্যকারকে ঘটনাপুঞ্জের কেন্দ্রিক সম্ভাব্যতা ও স্বাভাবিকতা রক্ষা করিতেই হইবে। ইহাই উৎকৃষ্ট কমেডির একমাত্র বিশেষত্ব।

কমেডি : আঙ্গিক ও শ্রেণীবিভাগ

কমেডিতেও নাট্যকার আখ্যানভাগের সূচনা, প্রবাহ, উৎকর্ষ ও গ্রন্থি-মোচনেব দ্বাব উত্তীর্ণ হইয়া সুকৌশলে স্বাভাবিক উপসংহারে উপনীত হন। প্রয়োজনবোধে কমেডিতেও মল আখ্যায়িকার সহায়ক অনুরূপ আখ্যায়িকাব অবতারণা চলিতে পাবে। কমেডি যদি অত্যধিক কল্পনাপ্রবণ বা কাব্যধর্ম্মী হয় তবে তাহা রোমান্টিক কমেডি (*Romantic Comedy*) নামে অভিহিত; যে-কমেডিতে সমাজের ধর্ম্ম, নীতি, রাষ্ট্র প্রভৃতির বিদ্রূপাত্মক অবতারণা থাকে, তাঁহাকে সামাজিক কমেডি (*Comedy of Manners*) কহে। ববীন্দ্রনাথ মৈত্রেব 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' ও প্রমথ বিশীব 'মৌচাকে ঢিল' এই শ্রেণীভুক্ত। যে-কমেডিতে কুশীলবগণ কোন চরিত্র বিশেষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-মূলক ক্রিয়াকলাপের দ্বাবা নাটকীয় পরিণতি দান কবে, তাহাকে চক্রান্ত-মূলক কমেডি (*Comedy of Intrigue*) বলে। শবৎচন্দ্রেব 'বিজয়া' এই শ্রেণীভুক্ত। এতদ্ব্যতীত, ইংরেজী সাহিত্যে *Comedy of Character, Comedv of Dialogue* প্রভৃতি শ্রেণী-বিভাগও দৃষ্ট হয়।

নাটকীয় বিষয়-বস্তু সন্নিবেশ বা কথা-বস্তু পরিবেশনের দিক হইতে আবও কয়েকপ্রকার নাটকেব উল্লেখ কবা যাইতে পাবে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক নাটক (*Historical Drama*) অতীত ইতিহাসেব কোন অধ্যায অবলম্বন করিযা লিখিত। নাট্যকাব ঐতিহাসিক সত্যকে

ঐতিহাসিক নাটক

ক্ষুণ্ণ না করিয়া শুধু সাহিত্যিক বা নাটকীয প্রয়োজনানুযাযী দুই চারিটী কল্পিত চবিত্র বা কল্পিত কাহিনী ইহাতে সমাবেশ কবিতে পারেন। 'কাব্য হিসাবে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিতে হইলে সমগ্র ইতিহাসকে অবিকৃতভাবে

গ্রহণ করা যায় না।' শুধু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, অতীতের যুগ-চিত্র হিসাবে নাটকখানি যেন ভাব-সত্যের অপলাপ না করে। সেক্সপীয়রের *Henry IV*, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত, শাজাহান প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক। নাটকীয় বিষয়-বস্তুর পরিণতি অনুযায়ী এই জাতীয় নাটককে ট্র্যাজিডি বা কমেডি শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

পৌরাণিক নাটক

পৌরাণিক নাটক (*Mythical Drama*) রামায়ণ মহাভারত বা প্রাচীন কোন কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। পৌরাণিক নাটকে অনেক সময় অতি-প্রাকৃতের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য পৌরাণিক তথ্যসমূহকে নাটকীয় রূপ দান করা। Æschylus-এর *'Prometheus Bound'*, Shelley-র *'Prometheus Unbound'*, এবং বাংলায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'জনা', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নর নারায়ণ' এই জাতীয় নাটক।

প্রহসন

প্রহসন (*Farce*) নামক আর এক প্রকার নাটকের উল্লেখ সংস্কৃতেও দেখা যায়। সমাজের কু-রীতি শোধনার্থে 'রহস্য-জনক' ঘটনা-সম্বলিত হাস্যরসপ্রধান একাঙ্কিকা নাটককে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ 'প্রহসন' বলিতেন। প্রাচীনকালের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ইংরেজী নাটকে মাঝে মাঝে হাস্যরস-চপলতা সৃষ্টি করিবার জন্য 'প্রহসন' ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান কালে 'প্রহসন' বলিতে অতিমাত্রায় লঘুকল্পনাময় হাস্যরসোদ্দীপক নাটককে বুঝায়। Sheridan-এর *The Scheming Lieutenant*, মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা,' দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী', রবীন্দ্রনাথের 'শেষ-রক্ষা' এই জাতীয় নাটক।

অতি-নাটক

প্রাচীন গ্রীক নাট্য-সাহিত্যে সঙ্গীত-সমন্বিত নাটককেই *Melodrama* নামে অভিহিত করা হইত। কিন্তু অধুনা, যে-নাটকে কাল্পনিক বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া চিত্তচমৎকারী, অস্বাভাবিক ঘটনাবিন্যাসের সাহায্যে আকস্মিক ও লোমহর্ষণ পরিণতি দান করা হয়, তাহাকে আমরা **অতি-নাটক** (*Melodrama*) বলিয়া অভিহিত করি। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে এই শ্রেণীর নাটকের

প্রাচুর্য্য বিস্ময়কব। গিবিশ ঘোষেব অধিকাংশ নাটক, দ্বিজেন্দ্রলালেব 'পবপারে'ও ববীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জন' এই শ্রেণীভুক্ত।

আধুনিক যুগে সাঙ্কেতিক নাটক (*Symbolic Drama*) নামে এক প্রকাব নূতন নাটকেব সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক যুগেব মানুষেব জীবন-সমস্যা প্রচীনকালেব যুগ-সমস্যা হইতে অনেক পবিমাণে পৃথক। বিশেষতঃ, আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসাব যুগ। আধুনিক মানব প্রত্যেক জিনিষকে তন্ন তন্ন কবিযা জানিযা লইতে চায। জিজ্ঞাসাই তাহার মনেব প্রধান প্রবৃত্তি। এইজন্য মানুষ ক্রমশঃই বহির্জগত হইতে নিজেকে ছিন্ন কবিযা নিজেব অন্তবেব দিকে মনোনিবেশ কবিতেছে—আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্ম-পবীক্ষা দ্বাবা মানুষ আত্ম-আবিষ্কাব কবিতে চাহিতেছে। "জীবনের এই অতীন্দ্রিয় বহস্য ও সাঙ্কেতিকতা সর্ব্বপ্রথম গীতিকবিতাব ছন্দে গাঁথা পড়ে। কিন্তু এই লীলাময বিকাশ যতই সুস্পষ্ট হইতেছে, যতই ইহা ব্যক্তিগত অনুভূতির সীমা ছাড়াইযা সাধাবণ পাঠকেব চিত্ত স্পর্শ কবিতেছে, বিশেষতঃ মানবমন যতই ইহাব আনন্দময ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে একটা সাগ্রহ কৌতূহল অনুভব কবিতেছে, ততই ইহা গীতিকবিতাব বাজ্য অতিক্রম কবিযা নাটকেব বিষয়ীভূত হইযা উঠিতেছে। এইরূপ একটা সম্পূর্ণ নূতন বকমেব নাট্যসাহিত্য আমাদেব চোখেব সম্মুখে সৃষ্ট হইতেছে।"* ইহাই **সাঙ্কেতিক নাটক**। এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে Maeterlinck-এব *The Blue Bird*, Edmond Rostand-এব *Chanticler*, Yeats-এব *The Land of Heart's Desire* এবং ববীন্দ্রনাথেব অচলায়তন, ডাকঘব, প্রভৃতি বিখ্যাত নাটক। এই সকল নাটকেব নাটকীয উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান, কাবণ যাহা মনোজগতেব ব্যাপাব তাহাকে বহির্জগতের সংঘটনাব (action) মধ্য দিয়া প্রকাশ করা খুব সহজ নহে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিববযব ভাব-সত্তাকে নাট্যোপযোগী কবিয়া পরিবেশন করা সুকঠিন। এইজন্য মানব-হৃদযেব

সাঙ্কেতিক নাটক

* ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যাব

নিভৃত প্রদেশই (*Theatre of the Soul*) ইহাদের উপযুক্ত বঙ্গমঞ্চ। পাদপ্রদীপের সম্মুখে ইহারা অভিনয়োপযোগী না হইলেও পাঠ্য-নাটক হিসাবে ইহাদের মূল্য সুনিশ্চিত।

সমস্যা-মূলক নাটক

আধুনিক ইংরেজী নাট্য-শিল্পে Ibsen ও Bernard Shaw-র কল্যাণে যুগান্তর আসিয়াছে। এলিজাবেথীয়, তথা Shakespeare-এর নাটকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া Ibsen-ই প্রথম বাস্তবমুখী নাটক লিখেন। তাঁহার অনুকরণে Bernard Shaw, Galsworthy প্রভৃতি যে-ধরনের বাস্তবতা-প্রধান নাটক লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শিল্প-সঙ্গত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি অপেক্ষা যুগচিত্তের ভাবনা, কামনা, সংস্কার ও সমস্যাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই সকল নব্যপন্থী নাট্যকারগণ নাটককে প্রাচীন নাট্যকারদের মত নিছক সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির বাহন রূপে গ্রহণ করিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে নাটক শুধু অবসরবিনোদন বা সৌন্দর্য্য-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য নয়; ইহার উদ্দেশ্য যুগ-কল্পনা ও যুগ-সমস্যার সমাধান, লোকশিক্ষা দান ও জনমত গঠন। আধুনিক যুগে রাষ্ট্র-সমস্যা বেকার-সমস্যা, জাতি-সমস্যা, ধর্ম্ম-সমস্যা, যৌন-সমস্যা, বিবাহ-সমস্যা প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার সমস্যা মানুষকে বিব্রত করিতেছে। নাট্যকারগণ কোন একটী সমস্যা অবলম্বন করিয়া কয়েকটী চরিত্র-সৃষ্টির সাহায্যে উহার সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করেন। নাট্যকার তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্য দিয়া স্বকীয় মতামত ব্যক্ত করেন—সেক্সপীয়রের মত নির্লিপ্ততা রক্ষা করিতে চাহেন না। এই সকল নাটকে plot বা ঘটনা-বিন্যাস এবং প্রশমন-দৃশ্য অবতারণা, স্বগতোক্তি বা আত্ম-ভাষণের স্থান নাই। নাট্যকার শুধু সমস্যাটীকে নানাদিক হইতে নানাভাবে আলোচনা (Discussion) দ্বারা উহার যথোচিত মূল্য নিরূপণ করিতে চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীর সমস্যা-প্রধান নাটককে ইংরেজীতে *Thesis Drama* অথবা *Drama of Ideas* নামে

অভিহিত করা হয়। বলাবাহুল্য, পৃথিবীর কোন দেশের শ্রেষ্ঠ নাটকই সমস্যা-বিহীন হইতে পারে না। তবে, শ্রেষ্ঠ নাটকে নাট্যকার সমস্যাকে নাটকীয় শিল্প-সঙ্গত রূপ-সৃষ্টির অধীন করিয়া প্রদর্শন করেন। ইহাতে নাটকের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই মুখ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রচার-মূলক নাটকে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রশ্নটী গৌণ করিয়া নাট্যকার সমস্যাটীকেই উগ্রতর করিয়া তোলেন। নাটকে প্রচার-মূলক কিছু থাকিতে পারে না, এমন কথা আমরা বলি না। তবে, প্রচারই যেখানে মুখ্য, সেখানে নাটকীয় শিল্প-সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে কিনা ইহাই ভাবিবার বিষয়। কারণ, শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য 'purposeless purpose' অর্থাৎ উদ্দেশ্যকে গৌণ করিয়া সৌন্দর্য্য-বোধটী মুখ্যরূপে সামাজিকের মনে সঞ্চার করা। এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে Ibsen-এর *The Doll's House*, Bernard Shaw-র *Man and Superman*, Galsworthy-র *Justice* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জন' ও গিরিশ ঘোষের 'বলিদানে' প্রচারের উগ্রতা পরিলক্ষিত হয়।

নাটক ও উপন্যাস উভয়ই মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি, তবু ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নাটক দৃশ্যকাব্য, উপন্যাস পাঠ্যকাব্য।

নাটক ও উপন্যাস

নাটকে প্রধান বস্তু ঘটনা-পারম্পর্য্য, উপন্যাসে ঘটনা-বিন্যাস; সাধারণতঃ, নাটক দ্রুতগতি, উপন্যাস ধীর-মন্থর। উপন্যাস আমরা পড়িয়া আনন্দ পাই, নাটক দেখিয়াও আনন্দ পাই। ঔপন্যাসিক পাঠকের কল্পনার উপর বেশি দাবী করেন না, সকল কথাই তিনি সাজাইয়া বলেন ও পাঠকের নিকট প্রত্যক্ষভাবে মূর্ত্ত করিয়া তোলেন। নাট্যকার দর্শকের কল্পনাশক্তির উপর অধিকতর দাবী করেন। দৃশ্যপট যোজনায় নাটকের অনেক অকথিত বাণী মূর্ত্ত হইয়া উঠিলেও, দর্শক নিজের কল্পনা বলে তাহারও অনেক অধিক অনুমান করেন। এইজন্য বুঝিবার পক্ষে উপন্যাস যত সহজ, নাটক তত সহজ নয়। এতদ্ব্যতীত, নাটকীয় বিষয়বস্তু রক্তমাংসের নরনারীর কথাবার্ত্তায় ব্যক্ত হয় বলিয়া ইহা উপন্যাসের বিষয়বস্তু অপেক্ষা অধিকতর

জীবন্ত মনে হয়। ঔপন্যাসিকের আবেদন একজন মাত্র পাঠকের নিকট, নাট্যকারের আবেদন বহুর নিকট। এক খণ্ডহীন অবসর সময়ে একাসনে বসিয়া না দেখিলে নাটকের আনন্দ লাভ করা যায় না; কিন্তু উপন্যাস একাসনে বসিয়া আদ্যোপান্ত শেষ না করিলেও ক্ষতি হয় না। ঔপন্যাসিক অধিকাংশ স্থলে যাহা বর্ণনার সাহায্যে প্রকাশ করেন, নাট্যকার তাহাকে দৃশ্যপট-সংযোজনায় ও রঙ্গমঞ্চ-সজ্জার সাহায্যে রূপ দান করেন। ঔপন্যাসিক তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির উত্থানপতন ও পরিণতি সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু নাট্যকারকে সুকঠিন নির্লিপ্ততা (Detachment) অবলম্বন করিতে হয়। ঔপন্যাসিক নিজের মন ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা তাহার চরিত্র-সৃষ্টিকে বিচার করেন, নাট্যকার প্রত্যেকটী চরিত্রের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দেন। নাটকে নায়ক-নায়িকাগণ স্বয়ং বক্তা, উপন্যাসে গ্রন্থকারই প্রধান বক্তা।

✓অনেক সময় নাট্যকার ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বজ্রগর্ভ মেঘ-প্রকম্পিত বিদ্যুৎ-শিহরিত দৃশ্য-পরিকল্পনায়, অথবা অভাবনীয় সময়ে অভাবনীয় ঘটনা-সংস্থানের দ্বারা অতি-লৌকিক জগতের উপযোগী পটভূমি সৃষ্টি করেন।

নাটকে অতি-প্রাকৃত সংস্থান

নাট্যোল্লিখিত নায়ক-নায়িকার মানসিক দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করিবার জন্যই এইরূপ অতি-প্রাকৃত (*Supernatural*) সমাবেশ প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ, অধিকাংশ স্থলে, যে-অদৃশ্য নিয়তিলীলা মানবভাগ্য পরিচালিত করিতেছে, তাহার ইঙ্গিত দান করিবার জন্যও নাট্যকার অতি-প্রাকৃতের সমাবেশ করেন।

Shakespeare-এর নাটকে এই অতি-প্রাকৃত দুইটি বিভিন্নরূপে প্রদর্শিত হয়। অনেক সময় ইহা বাহ্যপ্রকৃতির বিক্ষোভ-পরিকল্পনায় চিত্রিত হয়। ইহার সহিত নায়ক নায়িকার ব্যক্তিগত জীবনের কোন বিশেষ সম্পর্ক থাকেনা, কারণ ইহা মানব-কল্পনার অধীন নহে। *Macbeth*-এ প্রথম দৃশ্যে ডাকিনীগণের ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্ত্তা ও তরুলতাহীন বিস্তীর্ণ মৃত্যুময় প্রান্তর-পরিকল্পনা এবং মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী

নাটকে' ঝড় ও মেঘগর্জ্জনের ইঙ্গিত বিষাদাত্মক নাটকের উপযোগী ভাবমণ্ডল সৃষ্টির সহায়ক। নাট্যকার এইরূপ দুর্ভেদ্য মসীকৃষ্ণ পটভূমি সৃষ্টি করিয়া মানব-ভাগ্যকে সেই প্রাকৃতিক পটভূমিকায় চিত্রিত করিয়া নাটকের সকরুণ ঘনান্ধকার গাঢ়তর ও তীব্রতর করিয়া তোলেন।

অতি-প্রাকৃত কখনো বিকৃত-মস্তিষ্ক, উন্মত্ত অথবা নিয়তি-নির্য্যাতিত নায়কনায়িকার উক্তিরূপে নাটকে রূপ লাভ করে। *Macbeth* নাটকে ছায়া-ছুরি (Phantom dagger) ম্যাক্‌ব্যথেরই আত্ম-কৃত কর্ম্মের প্রতিফল রূপে দোদুল্যমান; *Julius Caesar* নাটকে Brutus-এর সম্মুখে Cæsar-এর প্রেতমূর্ত্তির আগমন একদিকে যেমন Brutus-এর আত্মকৃত কর্ম্মের প্রতিফল-ব্যঞ্জক, তেমনই আবার নবজন্ম-সন্ধানী প্রতিহিংসাপরায়ণ Caesar-এর বিজয়-সম্ভাবনার ইঙ্গিতরূপেও নাটকে পরিস্ফুট। *Julius Caesar*-এ Calpurnea-র স্বপ্নে যেমন অতি-প্রাকৃতের সাহায্যে অনাগত ঘটনার পূর্ব্বাভাষ সৃষ্ট হইয়াছে, মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'ও তেমন তপস্বিনীর স্বপ্নে মানসিংহ এবং জগৎসিংহের মধ্যে যুদ্ধ-সম্ভাবনা, কৃষ্ণার স্বপ্নে তাহার আত্মহত্যার ইঙ্গিত এবং অহল্যার স্বপ্নে কৃষ্ণার ভবিষ্যৎ স্পষ্টরূপে আভাসিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষেও 'কুন্দর' স্বপ্ন ভবিষ্যৎ সূচনার সহায় হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যায় যে, অতি-প্রাকৃত-সমাবেশের প্রধান উদ্দেশ্য নাটকীয় কথাবস্তুর ব্যাখ্যা ও সূচনা। নাটকীয় কলাকৌশলরূপে ইহা কখনো অনাগত কাহিনীর পূর্ব্বাভাষ জ্ঞাপন করে, আবার কখনো ঘটনাসমূহের যথাযথ ব্যাখ্যাদানে সমস্ত বিষয়টী দ্রষ্টার নয়ন-সম্মুখে স্ফুট করিয়া তোলে। কিন্তু কোন নাটকে অতি-প্রাকৃতের সমাবেশ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উহা নাট্যকারের ব্যক্তিগত অভিমত বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। নাট্যকার যুগ-চিত্তের পরিচয় দিতে গিয়া অনেক সময় ইহার অবতারণা করেন। অতিপ্রাকৃতের কলাকৌশলের সাহায্যে নাটকের করুণরস ঘনতর হইয়া উঠে। কিন্তু করুণরসের এরূপ তীব্রতা আমাদিগকে বেদনা-বিধুর ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে না।

বরং অতি-প্রাকৃত পরিবেশ দেখিয়া আমরা শুধু ইহাই মনে করি যে, নাটকের জগৎ আমাদের বাস্তব জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতেই অতি-প্রাকৃতের ভীতিগাঢ়তা মন্দীভূত হয় এবং যাহা একদিকে ভীতি-সঞ্চার করে, তাহাই আবার ভীতি-নিরসন করিতে সমর্থ হয়। আবার, একদিকে ইহা যেমন মানব-ইচ্ছার বহির্ভূত নিয়তি সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করে, অপরদিকে তেমন মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার সত্তাকেও স্বীকার করিয়া লয়। *Schlegel* যাহাকে বলেন, '*Necessity without, freedom within*', অর্থাৎ ভিতরে স্বাধীন ইচ্ছা-সম্পন্ন হইলেও, মানুষ বাহিরের নিয়তি-নিয়মকে কিছুতেই ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না, এই দুইটী তত্ত্বই অতি-প্রাকৃতের সাহায্যে যুগপৎ আমাদের গোচর করা হয়। অদৃষ্টের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে পরাভূত, আত্মবলে দৃপ্ত দুর্জ্জয় মানবাত্মা তখনই উপলব্ধি করে যে, সে একান্তভাবে দুর্ব্বল ও নিয়তি পরিচালিত হইলেও যে মানবিক দুর্ব্বলতার উপর নির্ভর করিয়া সে জীবনযুদ্ধে শক্তির পরিচয় দেয়, তাহাই তাহার গৌরব।

বিংশ শতাব্দীতেই একাঙ্ক নাটকের প্রাদুর্ভাব বেশি হইলেও ইংরেজী সাহিত্যে ইহা সম্পূর্ণ নূতন নহে। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে একাঙ্কিকার উল্লেখ আছে। রীতিসম্মত নাটক ও একাঙ্কিকার মধ্যে শুধু আকারগত নহে, শ্রেণীগত পার্থক্যও বর্ত্তমান। পূর্ব্বেকার পঞ্চমাঙ্ক নাটকে এক বা বহু ঘটনার সমাবেশ থাকিতে পারে এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে, দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে নাটকীয় বিষয়বস্তু বা পাত্রপাত্রীগণের পরিবর্ত্তন ইহাদের মতে অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু একাঙ্কিকায় একটি মাত্র বিশেষ ঘটনা-সংস্থানকে সংক্ষিপ্ত পরিধির মধ্যে একটী বিশেষ ভাব-সৃষ্টির সহায়রূপে পরিকল্পিত হয়। ছোটগল্প যেমন বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উপন্যাসের স্তরে উপনীত হইতে পারে না বা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণও যেমন ছোটগল্প নহে, তেমনি একাঙ্কিকাও স্ফীত-কলেবর হইয়া পঞ্চমাঙ্ক নাটক হইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে না,

একাঙ্ক নাটক
(One-Act Drama)

বা পঞ্চমাঙ্ক নাটকেব সংক্ষিপ্ত সংস্করণও একাঙ্কিকা নহে। এই জাতীয নাটকে সুদীর্ঘ কথাবার্ত্তা বা সুগভীর আত্ম-বিকৃতির অবসর নাই—স্বল্প সময়ে একটী সুনির্ব্বাচিত ঘটনার নাটকীয় চরম পরিণতি (*Climax*) দেখানোই ইহার উদ্দেশ্য।

ইহাতে একটী বিশেষ পবিবেশে (*Setting*), একটী ক্রম-প্রসাবী অবিচ্ছিন্ন দৃশ্য, একটী মাত্র চবিত্রকে কেন্দ্র করিয়া নাটকীয় চরম পবিণতি লাভ কবে এবং একটী বিশেষ ভাবানুভূতি (*Impression*) সৃষ্টিই ইহার লক্ষ্য। মাঝে মাঝে ঘটনা-প্রবাহেব দ্রুতস্রোতে বিস্ময় ও কৌতূহল সঞ্চার করিয়া নাট্যকার চরিত্রেব নাটকীয় গতি-বিধান করিবেন।

পঞ্চমাঙ্ক নাটকে নাটকীয় ঘটনাবলী আমাদেব নয়ন সমুখে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়। প্রথমাঙ্কে অনাগত কাহিনীর সূচনা বা অতীত ঘটনাবলী বর্ণনাদ্বারা নাট্যকার আমাদিগকে নাটকীয় ঘটনা-স্রোতেব কেন্দ্রস্থলে লইয়া আসেন। কিন্তু একাঙ্কিকায় নাটকীয় চরম পরিণতির সামান্য পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে, বা তন্মুহূর্ত্তেই, যবনিকা উত্থিত হয। সুতরাং, যবনিকা উত্থিত হইবাব পরই দ্রুত গতিতে ঘটনা-প্রবাহ বিস্তার লাভ করে।

একাঙ্ক নাটকের প্রাবম্ভে ঘটনাপুঞ্জ শান্ত বা বিক্ষুব্ধ, উভয়ই হইতে পাবে। কিন্তু প্রথম অঙ্কেই সামাজিকগণ যেন বুঝিতে পারেন যে, কী যেন সহসা বিস্ফুরিত হইযা নাটকের পরিণতি অবশ্যম্ভাবী করিয়া দিবে। প্রথম অঙ্কেই নাট্যোল্লিখিত চরিত্রাবলী ও তাহাদের পারস্পরিক যোগ-সূত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। এবং ক্রমে, বিস্ময ও কৌতূহল সঞ্চারের মধ্য দিয়া নাটকীয় ঘটনা-বিন্যাস চলিতে থাকিবে।

ঘটনাপুঞ্জ এমনভাবে বিন্যস্ত হইবে যে, নাটকীয় পরিবেশটী যেন বিদ্যুৎ-গর্ভ মেঘের ন্যায় আসন্ন বিপদ-সম্ভাবনায় কম্পমান হয়। যবনিকা উত্তোলনের পরেই পূর্ব্বইতিহাস-বিবৃতি (*Exposition*) রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হয়। তৎপর নায়কের চরিত্রের ভিতর-বাহিরের দ্বন্দ্ব-চিত্রটী ক্রমেই পরিস্ফুট হইতে থাকে এবং ঘটনাপুঞ্জ ক্রম-পরিণতির দিকে

অগ্রসর হয়। অন্যান্য ক্ষীণ দ্বন্দ্ব-স্রোত ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া নাটকীয় ঘটনা-স্রোতকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে। দৈব, নিয়তি বা আকস্মিক ঘটনা যথাপ্রয়োজনে নাটকে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে। এইভাবে নাটকীয় ঘটনাজাল ক্রমেই ঘনসন্নিবিষ্ট হইতে থাকে এবং সর্ব্বশেষ চরম শিখরে (Climax) উপনীত হয়।

নাটকীয় পরিণতি সন্তোষজনক বা শুভ হইলে তাহাকে কমেডি এবং দুঃখজনক হইলে ট্র্যাজিডি বলা হয়। কিন্তু, নাটকের চরম মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে আখ্যানবস্তু সম্যকরূপে কমেডি বা ট্র্যাজিডি রূপে পরিস্ফুট হয় না। কখনো বা নাটকীয় চরম পরিণতি এবং আখ্যান-গ্রন্থি-মোচন একই সঙ্গে চলিতে থাকে।

একাঙ্ক নাটকে দুই বা ততোধিক চরিত্র থাকিলেও একটী বিশেষ চরিত্রের বিকাশই উহার মুখ্য অভিপ্রায় বলিয়া পরিগণিত হয়। স্বাতন্ত্র্য-বিশিষ্ট বিভিন্ন চরিত্রগুলি পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নাটকীয় চরম পরিণতিকে সম্ভাব্য করিয়া তোলে। জীবন ও নাটকীয় ঘটনাপুঞ্জের সম্বন্ধে কুশীলবগণের বিভিন্ন ধারণা বা কথাবার্ত্তাই নাটকীয় বৈচিত্র্য সম্পাদন করে। চরিত্র-সৃষ্টির মূলে যাহাতে ভাব-সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, সে বিষয়ে নাট্যকার অবহিত হইবেন।

মনে রাখিতে হইবে যে, একাঙ্ক নাটকে, কখনো চরিত্র, কখনো বিষয়বস্তু বা কখনো পরিবেশ-সৃষ্টি—ইহাদের যে-কোন একটীর দ্বারাও নাটকীয় রসঘনতা সৃষ্টি হইতে পারে। ইংরেজীতে Synge-এর *Riders to the Sea,* Maurice Baring-এর *The Rehearsal,* Olive Conway-এর *Becky Sharp,* Drinkwater-এর *X=0* প্রভৃতি সুবিখ্যাত একাঙ্ক নাটক। গিরীশ ঘোষ 'প্রহ্লাদ চরিত্র' ও 'বৃষকেতু' নামক পৌরাণিক একাঙ্ক নাটক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এই দুইটী নাটকে একাঙ্কিকার কলা-কৌশল প্রশংসনীয় নহে। আধুনিক যে কয়েকজন লেখক একাঙ্কিকা লিখিতেছেন তন্মধ্যে মন্মথ রায় ও প্রমথ বিশীর নাম উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক কালে যাহাকে আমরা নাটক বলি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাহা ছিল না। যাত্রা, কথকতা, টপ্পা, খেউড, হাঁফ, আখড়াই, মঙ্গলকাব্য কবিগান প্রভৃতিই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রধান সম্বল। তবে, সে কালেও যাত্রার ধরন-ধারণে কৃষ্ণলীলা, শিব বা শক্তি-মাহাত্ম্য, রামায়ণকথা প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয় লইয়া মাঝে মাঝে নাট্যগীত সম্পন্ন হইত।

বাংলা নাট্য সাহিত্য

যাত্রা নামক Morality Play হইতে নাটকের সৃষ্টি হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। অবশ্য, যাত্রার মধ্যে এমন উপকরণ ছিল, যাহাকে ইচ্ছা করিলে নাটকে পরিণত করা যাইত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজী নাটকের আদর্শে বাংলা নাটকের সৃষ্টি হয়। প্রথম যুগের বাংলা নাটকে সংস্কৃত প্রভাব যথেষ্ট ছিল এবং নাট্যকারগণ সাধারণতঃ বহুবিবাহ বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক বিষয় অবলম্বন করিয়া নাট্যরচনা করিতেন।

যতদূর জানা যায়, General Assembly-র গণিত-শিক্ষক তারাচাঁদ শিকদার প্রণীত 'ভদ্রার্জ্জুন' (১৮৫২) নাটকই ইংরেজী আদর্শে রচিত প্রথম বাংলা নাটক। ১৮৫৩ সালে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' প্রকাশিত হয়। ইহাতে সেক্সপীয়রের *The Merchant of Venice*-এর সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহার ভাষা সরল হইলেও ইহা নাটকোপযোগী নয়। চরিত্র-সৃষ্টিতেও লেখক দক্ষতার পরিচয় দেন নাই। হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭—৪৪) 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৮), 'চারুমুখ চিত্তহারা' (১৮৬৪), 'রজতগিরিনন্দিনী' (১৮৭০) প্রভৃতি নাটকও লিখেন। ইহার পর রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' (১৮৫৪) প্রকাশিত হয়। ইহাতে সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ধরণ লক্ষিত হইলেও, ইহার আখ্যানবস্তু অসংহত ও বৈচিত্র্যহীন ; নাটকীয় চরিত্রগুলির মানসিক দ্বন্দ্ব অপরিস্ফুট এবং প্রায় সমগ্র নাটকটী লেখকের মতামতে ভারাক্রান্ত। ডাঃ সুশীলকুমার দে বলেন যে, 'এই নাটকটী একটি সামান্য কৃত্রিম মূল সূত্রের উপর গ্রথিত সংলগ্ন বা অসংলগ্ন দৃশ্যের সমষ্টি মাত্র' *। তবু

* প্রাচীন বাংলা নাটক ও তাহার অভিনয় (প্রবন্ধ)

ইহাই বাংলাভাষায় প্রথম সামাজিক নাটক। এই লেখক 'বেণী-সংহার' (১৮৫৬), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), 'নবনাটক' (১৮৬৬) প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক লিখেন। রামনারায়ণের প্রভাবে তারকচন্দ্র চূড়ামণি ১৮৫৭ সালে 'সপত্নী নাটক' নামে বহুবিবাহ-মূলক একখানা নাটক লিখেন। ইহা ভাষার কৃত্রিমতা, কথোপকথনের অস্বাভাবিকতা, চরিত্রের বহুলতা ও শোকাবহ ঘটনার আতিশয্যে পীড়িত। এই সময়ে শ্যামাচরণ দত্ত নামে জনৈক ভদ্রলোক 'অনুতাপিনী নবকামিনী' (১৮৫৬) নামে Rowe-র *Fair Penitent*-এর অনুবাদ প্রকাশ করেন। খুন, ব্যভিচার, আত্মহত্যা প্রভৃতি লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটনে ইহা এলিজাবেথীয় *'Blood and Thunder'* ট্র্যাজিডির সগোত্র।

রামনারায়ণের পর মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) ও দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাটকে যুগান্তর আনয়ন করেন। মধুসূদন প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের রীতি-পদ্ধতির শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া ইংরেজীর অনুকরণে নাটক লিখেন। তাঁহার 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' (১৮৫৮) তৎকালীন রঙ্গমঞ্চে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। তাঁহার 'পদ্মাবতী নাটকে' গ্রীক প্রভাব সুস্পষ্ট। এই নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্র ছন্দ ব্যবহার করেন। ইহার পর 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬০) প্রকাশিত হয়। ইহাতে ইংরেজী রোমাণ্টিক নাটকের অনুকরণে বিয়োগবিধুরা নায়িকা (Tragic Heroine), খল-চরিত্র (Villain), প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী (Rival Claimants), নাটকীয় প্রশমন (Comic Relief) প্রভৃতি আছে। ইহাই বোধ হয় বাংলায় প্রথম বিয়োগান্ত নাটক। ঘটনাবৈচিত্র্য না থাকিলেও ইহাতে চরিত্র-সৃষ্টি প্রশংসনীয়। এতদ্ব্যতীত, তিনি 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক সামাজিক প্রহসন লিখেন।

মধুসূদনের পর দীনবন্ধু মিত্রের (১৮২৯—৭৩) 'নীলদর্পণ' নাটকে বাস্তবতার সুর গভীরতর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৫) আরও উন্নত ধরণের নাটক। কিন্তু 'লীলাবতী' (১৮৭৬) নাটকে দীনবন্ধু যে অপূর্ব্ব রচনাশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি,

ঘটনা-বিন্যাস-নিপুণতা, চরিত্রাঙ্কন-দক্ষতা ও হাস্যরস-সৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বাংলা নাট্যসাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশিত হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, তিনি 'বিয়ে পাগল বুঁড়ো' 'জামাই বারিক', 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি প্রহসনও লিখিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী', মনোমোহন বসুর (১৮৩১—১৯১২) 'সতী নাটক' (১৮৭৩) এবং 'হরিশ্চন্দ্র'ও (১৮৭৪) তৎকালে আদৃত হইয়াছিল। জনপ্রিয় গিরীশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৩—১৯১১) একাধারে স্রষ্টা ও বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটক 'জনা', 'বুদ্ধদেব'; ঐতিহাসিক নাটক 'কালাপাহাড়'; সামাজিক নাটক 'বলিদান', 'প্রফুল্ল'; এবং গীতিনাট্য 'আবু হোসেন' উল্লেখযোগ্য। অনেকে গিরিশচন্দ্রকে বাঙ্গালার সেক্স্‌পীয়র বলেন, যদিও তিনি সেক্স্‌পীয়রের সুদূর-প্রসারী দিব্য-দৃষ্টি ও অলৌকিক প্রতিভার মোটেই অধিকারী ছিলেন না।

দ্বিজেন্দ্রলালের (১৮৬৩—১৯১৩) ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'শাজাহান' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। 'কল্কিঅবতার', 'ত্র্যহস্পর্শ', 'প্রায়শ্চিত্ত', প্রভৃতি কয়েকটী প্রহসনে দ্বিজেন্দ্রলাল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক নাটকের মধ্যে 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী' বিখ্যাত। মানবজীবনের দ্বন্দ্ব-বহুল কাহিনী, জীবনের দুঃখদৈন্য ও ঘাতপ্রতিঘাত তাঁহার নাটকে অপরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। কিন্তু তাঁহার ভাষা অলঙ্কারবহুল, বক্তৃতাত্মক ও অতিমাত্রায় গীতিপ্রবণ।

দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িকদের মধ্যে অমৃতলাল বসু (১৮৫৩—১৯২৯), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬১—১৯২৭) ও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য। ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটক 'আলমগীর', 'প্রতাপাদিত্য', পৌরাণিক নাটক 'সাবিত্রী', 'ভীষ্ম', 'নর-নারায়ণ' প্রভৃতি বিশেষ পরিচিত। কল্পনার প্রখরতা, ভাষার ওজস্বিতা ও রুচির শালীনতা তাঁহার নাটকের বিশিষ্ট গুণ। অমৃতলাল বসু 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'বাবু', 'খাস-দখল', 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক নাটকে জীবনের লঘু-আনন্দের দিকটি পরিবেশন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১) মূলতঃ কবি এবং তাঁহার অধিকাংশ নাটকে নাটকীয় গুণ অপেক্ষা 'লিরিকের' প্রাধান্যই বেশি। পাঠ্য নাটক হিসাবে ইহাদের মূল্য সুনিশ্চিত। 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জ্জন', 'চিরকুমার সভা' প্রভৃতি তাঁহার সুবিখ্যাত নাটক। 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি সাঙ্কেতিক নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে নাটক লেখার কাজটী গ্রন্থকারের হাত হইতে ক্রমশঃ পেশাদার থিয়েটারের ম্যানেজার বা অভিনেতার হাতে চলিযা যাইতেছে। ফলে, তাঁহারাই একাধাবে নাট্যকার ও অভিনেতা। বর্ত্তমানযুগের নামজাদা উপন্যাসগুলিকে নাট্যরূপ দান করিয়া থিয়েটার বা বায়স্কোপের ম্যানেজারগণ দর্শকের মনস্তুষ্টি করিতেছেন। এই যুগের নাটকের মধ্যে শিশির ভাদুড়ী ও জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত নাটক'; নিশিকান্ত বসুর 'দেবলাদেবী', 'পথেব শেষে'; মন্মথ রায়ের 'চাঁদসদাগর'; যোগেশ চৌধুবীব 'বাংলার মেয়ে'; রবীন্দ্র মৈত্রেব 'মানময়ী গার্লস স্কুল'; শচীন সেনের 'ঝড়ের রাতে' ও প্রমথ বিশীর 'ঋণং কৃত্বা' মঞ্চ-সাফল্যের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য।

উপন্যাস

ইংরেজী ও বাংলা উভয় সাহিত্যেই উপন্যাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক সৃষ্টি। গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন ও জীবনানুভূতি কোন বাস্তব কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্ম্মে রূপায়িত হয তাহাকে **উপন্যাস** কহে। ঔপন্যাসিকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য সুন্দর করিয়া সুরসাল করিয়া উপন্যাসের আখ্যানভাগ বা গল্পটীকে বর্ণনা করা। এই গল্পটী উপন্যাসের কোন চরিত্র, বা উপন্যাসের ঘটনা বহির্ভূত অন্য কোন চরিত্র অথবা গ্রন্থকারের নিজের কথায় বলা যাইতে পারে। বর্ণনায় কখনো কখনো নাটকীয়তা এমন কি গীতিপ্রবণতাও থাকিতে

পারে। এইজন্যই মূলতঃ বর্ণনাত্মক হইলেও উপন্যাসে নাটকীয়তা ও গীতিপ্রবণতার লক্ষণ থাকিতে পারে। উপন্যাসের উদ্দেশ্য, গ্রন্থকার জীবনের যে আলেখ্য দেখিয়াছেন, তাহার বর্ণাঢ্যতা পাঠকহৃদয়ে সঞ্চারিত করা।

উপন্যাসের গঠনরীতি

উপন্যাসকে কেহ কেহ 'পকেট থিয়েটার' বা 'ক্ষুদ্র নাট্যবেশ্ম' নামে অভিহিত করেন। ইহার ঘটনাবলী কয়েকটী চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে। অনেকে মনে করেন, উপন্যাসে ঘটনাই মুখ্য, চরিত্র-সৃষ্টি গৌণ। আবার অনেকে উপন্যাসে কয়েকটী বিশেষ চরিত্রকে ঘটনা-সংঘাতে জীবন্ত করিয়া তোলেন। আমাদের মনে হয়, ঘটনা ও চরিত্র-সৃষ্টি পরস্পর নিরপেক্ষ নহে—একটী অপরটির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। চরিত্রই উর্ণনাভের মত আপনার চারিদিকে ঘটনার জাল বুনিয়া ঘটনা-প্রবাহ সৃষ্টি করে, এবং ঘটনাই চরিত্র-স্ফূর্তির সাহায্য করে। শরৎচন্দ্র বলেন যে ঔপন্যাসিকের পক্ষে কতকগুলি চরিত্র, প্লট এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা —এই তিনটি বিশেষ প্রয়োজনীয়—

অন্যান্য গ্রন্থকারদের যা নিয়া বিপদ— প্লট পায় না— সেই প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোন দিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া নেই, তাহাদিগকে ফোটাবার জন্য যাহা দরকার তাহা আপনি আসিয়া পড়ে।............আসল জিনিষ কতকগুলি চরিত্র—তাকে ফোটাবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়। †

সুতরাং ঔপন্যাসিক সুবিহিত ও সুসমঞ্জস ঘটনা-বিন্যাস দ্বারা চরিত্র-সৃষ্টির সহায়ক হইবেন, ইহাই মুখ্য কথা। চরিত্র ও ঘটনাবলীর বিন্যাসের মধ্য দিয়া জীবনের প্রবাহ সৃষ্টি হয়। পাত্রপাত্রীগণের কথোপকথন উপন্যাসের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সাবলীল, সহজ ও স্বাভাবিক সংলাপ উপন্যাসের চরিত্র-বিকাশের সহায়ক। এতদ্ব্যতীত, যে-দেশের,

---

* *Cf.*—'A novel is a personal, a direct impression of life'—Henry James.

† অভিনন্দনের উত্তর

যে-কালের, যে-সমাজের উপন্যাস লেখা হইতেছে, সেই দেশ-কাল-সমাজের রুচি, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি অনুযায়ী যথাযোগ্য পটভূমি নির্ব্বাচন ও যুগ-চিত্ত অঙ্কন-প্রচেষ্টাও উপন্যাসে চলিতে পারে। কোন বিষয়েব অযথা দীর্ঘ বর্ণনা শোভনীয় নয়। ইহা পাঠকের পক্ষে ক্লান্তিকর হইতে পারে। কোন কোন ঔপন্যাসিক বিশেষ কোন স্থান বা জেলার অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার বা জীবন-যাত্রার আখ্যান লইয়া উপন্যাস বচনা করেন। এই জাতীয় উপন্যাসে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান থাকে। Thomas Hardy-র উপন্যাসে *Wessex*-এর মানবচিত্র, গর্কি বা ডষ্টোভেস্কির উপন্যাসে রাশিয়াব বিশেষ পরিবেশ, ও তারাশঙ্করের গল্পে ও উপন্যাসে বীরভূম জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশ-রচনা আছে। এই জাতীয় উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাস বা *Regional Novel* কহে।

ইহাব পব উপন্যাসের ভাষা। ইহাকে উপন্যাসের চিৎ-শক্তি বলিযা গ্রহণ করা যাইতে পারে, কারণ একমাত্র সহজ ও সাবলীল ভাষাব গুণেই গ্রন্থকার পাঠকের কল্পনা-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। সর্ব্বশেষ কথা, প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই জীবন ও জগতের যে-রহস্য উদ্ঘাটন কবিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য বা আলোচনাও উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে থাকিতে পাবে। কোন কোন ঔপন্যাসিক বিশেষ কোন তত্ত্বকথা বা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাহার ধ্যানধারণা, অথবা কোন সামাজিক বা নৈতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে মীমাংসাব সন্ধান দিতে চাহেন। কিন্তু মনে বাখিতে হইবে, খোলাখুলি ভাবে উপন্যাসে এই প্রচার কার্য্য চলিলে উপন্যাসের শিল্প-সঙ্গত সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক স্পষ্টভাবে উপদেষ্টার বেদীতে আরোহণ করেন না—জীবনের গতি-প্রকৃতি পাঠকের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া অপ্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান করিতে পারেন।

উপন্যাসকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায় :—

(১) **ঐতিহাসিক উপন্যাস**—এই জাতীয় উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমসাময়িক জীবনের বিষয়বস্তু লইয়া উপন্যাস রচনা করেন না।

তিনি অতীতমুখী—অতীতের কাহিনীকে তিনি উপন্যাসে প্রাণবান করেন। অতীতের প্রতি ঔপন্যাসিকের শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও প্রেম-বিমুগ্ধ চিত্তই তাঁহার উপন্যাসকে মাধুর্য্য দান করে। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের পক্ষে অতীত জীবনের ইতিহাস, অতীতের রীতি-নীতি, সংস্কার, প্রচলিত গান, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকিতে হইবে, নতুবা তাঁহার উপন্যাসে কালবিরোধ-দোষ (*Anachronism*) ঘটিতে পারে এবং তিনি যে-কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। অবশ্য, রস-রূপেব সৌষম্য সৃষ্টি করিবার জন্য লেখক দুই এক জায়গায় ঐতিহাসিক তথ্যঘটিত ভুল করিলেও তেমন ক্ষতিকর হয় না। 'ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাসে লেখক সর্ব্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন।'* কিন্তু অতীতের বিশেষ যুগশাসিত জীবনযাত্রার কাহিনীটী তাঁহাব লেখায় জীবন্ত হইয়া উঠিতে হইবেই। ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেব মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

'ইতিহাস পড়িব না আইভান্‌হো পড়িব? ইহার উত্তর অতি সহজ। দুই-ই পড়ো। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য আইভান্‌হো পড়ো।……কাব্যে যদি ভুল শিখি, ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব।' †

ইংরেজী সাহিত্যে Scott-এর *Ivanhoe.* Thackeray-ব *Esmond* ও বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম', রমেশচন্দ্র দত্তেব 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', রবীন্দ্রনাথের 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

(২) **সামাজিক উপন্যাস**—যে উপন্যাসে সমাজের রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়বস্তুর অবতারণা থাকে তাহাকে সামাজিক উপন্যাস কহে। এই শ্রেণীর উপন্যাসে কোন সমস্যা বা মতবাদ প্রচার কামনেচ্ছা উগ্র হইয়া উঠিলে তাহাকে উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস

* বঙ্কিমচন্দ্র; রাজসিংহ—বিজ্ঞাপন

(*Purpose Novel*) বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী', শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' ও রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'-এ প্রচারের কামনা উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কোন উপন্যাসে আখ্যানভাগ নিয়ন্ত্রণ-কৌশল অপেক্ষা যদি চরিত্র-চিত্রণ ও চরিত্র-বিশ্লেষণ মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহাকে মনস্তত্ত্বমূলক (*Psychological*) উপন্যাস নামে অভিহিত করা যায়। ইংরেজীতে Meredith, D. H. Lawrence ও বাংলায় শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীয় উপন্যাস সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত।

(৩) **কাব্যধর্ম্মী উপন্যাস**— আখ্যানভাগ নিয়ন্ত্রণ-কুশলতা বা চরিত্র-সৃষ্টি-নৈপুণ্য অপেক্ষা গ্রন্থকারের কবিদৃষ্টি যে-উপন্যাসের জীবন-দর্শনকে স্নিগ্ধ ও মধুর করিয়া তোলে তাহাকে কাব্যধর্ম্মী উপন্যাস বলা যাইতে পারে। ইংরেজীতে যাহাকে রোমান্স বলে, তাহা খাঁটী উপন্যাস নহে—কারণ উহা বাস্তবজীবন বিমুখীন। তথাপি ইহার উচ্ছ্বাসময় বর্ণাঢ্যতা ও বাস্তববিমুখীনতা ইহাকে কাব্যসৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করে বলিয়া ইহাকেও কাব্যধর্ম্মী উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত করা অন্যায় হইবে না। এই হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র মত রোমান্সকেও কাব্যধর্ম্মী উপন্যাস বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' ও Hardy-র অধিকাংশ উপন্যাস এই শ্রেণীর।

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

ইংরেজী ও বাংলা উভয় সাহিত্যেই খুন, আত্মহত্যা, জখম, খানাতল্লাশ বা গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশের অশেষ কৃতিত্বপূর্ণ এক জাতীয় লোমহর্ষণ উপন্যাস আছে, ইহাদিগকে **ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস** বলে। এই জাতীয় উপন্যাসে আখ্যানভাগ অতি জটিল ও সর্পিলগতি। ঘটনার অভাবনীয় বিন্যাসে ও লোমহর্ষণ অদ্ভুত কাহিনী-সৃষ্টিতে এই শ্রেণীর উপন্যাসের কৃতিত্ব। ইহাদের মধ্যে জীবনের কোন গভীর তত্ত্ব বা তথ্যালোচনা থাকে না, জীবনের নারকীয় দিকটাই উদ্ভাসিত হয়। অনেকের ধারণা, এই জাতীয় উপন্যাস পাঠে সাধারণবুদ্ধি ও কুটবুদ্ধি প্রখরতা প্রাপ্ত হয়। যাহাই হোক, অবসর-বিনোদনের পক্ষে অনেকে এই ধরণের উপন্যাস পছন্দ করেন। ইংরেজী সাহিত্যে Conan

Doyle ও বাংলায় পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্রকুমার রায়, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই শ্রেণীর লেখক হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা হইলেও ইতিপূর্ব্বে প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) লিখিয়া বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের বীজ বপন করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩) প্রকাশিত হয়। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা ভাষায় প্রথম সামাজিক উপন্যাস হইলেও ইহাতে ঔপন্যাসিক কলাকৌশল তেমন দৃষ্ট হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রই (১৮৩৮—১৮৯৪) প্রথম বাংলা উপন্যাস সৃষ্টি করিয়াছেন। সেক্স্‌পীয়রের নাটকীয় কল্পনা ও স্কটের বর্ণনানৈপুণ্য—এই দুইয়ের সমন্বয়ে তাঁহার উপন্যাস অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। Plot বা আখ্যায়িকা রচনায়, স্বাতন্ত্র্য-বিশিষ্ট চরিত্র-সৃষ্টিতে এবং সর্ব্বোপরি বাস্তবের উপর পরম রমণীয় একটী আদর্শের ছায়াসঞ্চারে বঙ্কিমের উপন্যাস অতুলনীয়। কল্পনা ও বাস্তব, ইতিহাস ও রোমান্সের এমন অভিনব সমন্বয়-সাধন আজ পর্য্যন্ত কাহারও উপন্যাসে সংসাধিত হয় নাই। তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপাল-কুণ্ডলা' (১৮৬৭), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), প্রভৃতি উপন্যাসে যেন শুধু কবি বঙ্কিমের কল্পনা-কান্তি; দ্বিতীয় স্তরের 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' (১৮৭৮) লোকরঞ্জনের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন; তৃতীয় স্তরে 'আনন্দমঠ' (১৮৭২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) 'সীতারাম' (১৮৮৭) প্রভৃতিতে তিনি মানবজীবনের সমগ্র বৃহত্তর কর্ত্তব্য বা ধর্ম্মবোধকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। মোটের উপর, কাব্য, নাটক ও উপন্যাস—এই তিনটীর রস একত্র পরিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্র অদ্বিতীয়।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িকদের মধ্যে তারকনাথ গাঙ্গুলীর 'স্বর্ণলতা', রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮—১৯০৯) 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবী-কঙ্কন', 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা', 'মহারাষ্ট্র-জীবন-প্রভাত' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং

উপন্যাস

'সমাজ' ও 'সংসার' নামক দুইখানা সামাজিক উপন্যাস, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭—১৯) 'মেজ বৌ', 'যুগান্তর', দামোদর মুখোপাধ্যায়ের (১৮৫৩—১৯০৭) 'বিমলা', সঞ্জীবচন্দ্রের (১৮৩৪—১৮৮৯) 'জালপ্রতাপ', মাধবীলতা' ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর (১৮৫৫—১৯০৬) 'মডেল ভগিনী' ও 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহারা প্রত্যেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা-দীপ্তির অন্তরালে কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে-আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহারই ধারা উন্নত, প্রশস্ত ও দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) হাতে। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর কল্পনায়, অনির্ব্বচনীয় ভাবদৃষ্টিতে ও সত্য-সন্ধানী মনোবিশ্লেষণ-শক্তিতে যে-ধরণের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-মূলক উপন্যাস রচিত হইয়াছে, তাহা বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সামগ্রী। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে 'নৌকাডুবি' 'চোখের বালি', 'ঘরে বাইরে', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের দুরারোহিনী কল্পনার উর্দ্ধশাখায় যে ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬—১৯৩৮) উপন্যাসে সাধারণের উপজীব্য রূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বাস্তব জীবনের চিত্রটী প্রাণের স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়াছে। আত্মঘাতী সমাজ-জীবনের অন্তরাল-নিহিত বেদনা-বাষ্প এবং বাংলার উপেক্ষিত ও অনাদৃত মনুষ্যত্ব শরৎ-সাহিত্যে রূপ লাভ করিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে 'দেবদাস', 'পল্লীসমাজ', 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহ' বিখ্যাত।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়েকজন মহিলা ঔপন্যাসিক আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী এবং নিরুপমা দেবীর নাম এক শ্রেণীর পাঠক সমাজে পরিচিত। ইহাদের উপন্যাসে কোন অভিনবত্ব নাই, বরং ভাবপ্রবণতা ও উচ্ছ্বাসবহুলতায় ইহাদের লেখা ভারাক্রান্ত। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িকদের মধ্যে একমাত্র নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের উপন্যাসে বিশিষ্ট বাস্তবতার সুর পাওয়া যায়। যৌন ও অপরাধতত্ত্বমূলক উপন্যাস রচনায় তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অগ্নি-সংস্কার, শুভা ও রক্তের ঋণ তাঁহার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আদর্শবাদই জয়ী হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে জীবনের আদর্শ, রবীন্দ্রনাথে ভাবের আদর্শ ও শরৎচন্দ্রে হৃদয়াবেগের আদর্শই বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল।

পরবর্ত্তীকালে, প্রধানতঃ নরেশচন্দ্রের প্রভাবে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় পাদের অতি-আধুনিক সাহিত্যবিলাসী সম্প্রদায় বাংলা সাহিত্যে অকুণ্ঠ বাস্তবতার আমদানী করিয়াছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের পর তারাশঙ্করের আবির্ভাবই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করে।

শরৎচন্দ্রের মানবতাবোধ ও প্রীতিস্নিগ্ধ সমাজসচেতনতা তারাশঙ্করে বিস্তৃত রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা ও কালিন্দী তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস। শরৎচন্দ্র আবেগপ্রধান, তারাশঙ্কর বুদ্ধিপ্রধান; শরৎ প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তি-সচেতন, পরোক্ষভাবে সমাজসচেতন; তারাশঙ্কর প্রত্যক্ষভাবে সমাজসচেতন, পরোক্ষভাবে ব্যক্তি-সচেতন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও সরোজকুমার রায় চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস সৃষ্টি করিবার কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন। তাঁহাদের উভয়ের লেখায় যে-ধরণের বাস্তবতা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা সুস্থ জীবনরসিকের দৃষ্টি-সম্ভূত।

'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' লিখিয়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে অভিনব আত্মকেন্দ্রিক ভাবদৃষ্টি ও মনোবিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু 'বনফুলের' মত বিশুদ্ধ জীবন-দৃষ্টি সম্পন্ন ঔপন্যাসিক আধুনিক যুগে এই পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। জীবন সম্বন্ধে তাঁহার জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল অপরিমিত। তাঁহার জীবন-দর্শন যেমন স্বচ্ছ কাব্য-সৌন্দর্য্যে স্নিগ্ধ, চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতাও তেমন নিপুণ ও সুদৃঢ়। সম্প্রতি প্রকাশিত 'সপ্তর্ষি' উপন্যাসে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় তথা বাংলার পুনরুজ্জীবনের ঐতিহাসিক পটভূমিকা অবলম্বনে প্রশংসনীয় চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'রাত্রি' বাংলা সাহিত্যে একটী অপূর্ব্ব কাব্য-উপন্যাস। ইহাতে যে শুধু সৌন্দর্য্য-

পূজারীর প্রকৃতিপূজা আছে তাহাই নয়; চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়াও এই উপন্যাসটী মহিমময়।

আধুনিক কালে যাঁহারা বাংলা উপন্যাস সাহিত্য সমৃদ্ধ করিতেছেন তন্মধ্যে, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, প্রবোধ সান্যাল প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ছোটগল্প

ছোটগল্প

ছোটগল্প একদিকে যেমন নূতন, অপরদিকে তেমন পুরাতন। ইতালীয় সাহিত্যে Boccaccio-র *Decameron*, ইংরেজী সাহিত্যে, Chaucer-এর গল্প, *Æsop's Fables*, সংস্কৃতে বিষ্ণুশর্ম্মার 'হিতোপদেশ' ও 'পঞ্চতন্ত্র', বৌদ্ধ-সাহিত্যের জাতকের গল্প, 'দিব্যাবদান' নামক গল্প-সাহিত্য প্রভৃতি ছোটগল্পের চিরন্তন আবেদনেরই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আধুনিক ছোটগল্প একপ্রকার নূতন রূপ-সৃষ্টি। প্রাচীনকালের গল্পের মত ইহারা যথেচ্ছ-বিহারী, প্রগল্ভ ও নিরুদ্দেশ-পন্থী নহে। আধুনিক গল্প-লেখক বিষয়বস্তু, চরিত্র-সৃষ্টি, কথোপকথন, পরিবেশ-সৃষ্টি, বাণীভঙ্গি প্রভৃতি প্রত্যেকটী বিষয় সম্বন্ধে একান্তভাবে সজাগ বা আত্ম-সচেতন।

গল্প, এবং আকৃতিতে ছোট হইলেই ছোটগল্প হয় না। আকৃতিগত ব্যতীত প্রকৃতিগত এবং মর্ম্মগত অনেক বিভিন্নতা ইহাকে উপন্যাস হইতে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে। *E. A. Poe* (১৮০৯—৪৯) বলেন যে, যে-গল্প এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া শেষ করা যায়, তাহাকে ছোটগল্প বলে; *H. G. Wells* বলেন যে, ছোটগল্প ১০ হইতে ৫০ মিনিটের মধ্যে শেষ করা চাই। আসল কথা এই যে, ছোটগল্প আকারে ছোট হইবে বলিয়া ইহাতে জীবনের পূর্ণাবয়ব আলোচনা থাকিতে পারে না; জীবনের খণ্ডাংশকে যখন লেখক রস-নিবিড় করিয়া ফুটাইতে পারেন,

তখনই ইহার সার্থকতা। জীবনের কোন একটী বিশেষ মুহূর্ত্ত কোন বিশেষ পরিবেশেব মধ্যে কেমন ভাবে লেখকের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, ইহা তাহারই ইতিহাস। আকাবে ছোট বলিয়া এখানে বহু ঘটনা সমাবেশ বা বহু পাত্রপাত্রীর ভিড সম্ভবপব নহে। ইহাতে অনাবশ্যক কথা, অনাবশ্যক ভাষা, অনাবশ্যক চবিত্র ও ঘটনা প্রভৃতিকে নিষ্ঠুর ভাবে বর্জ্জন করিয়া লেখক শুধু একটী বসঘন নিবিড় মুহূর্ত্তের জয়োল্লাস পরিকল্পনায় মগ্ন থাকেন এবং আত্মকেন্দ্রিক মনোভিনিবেশের সাহায্য গ্রহণ করেন। ছোটগল্পের আরম্ভ ও উপসংহাব নাটকীয় গুণে মণ্ডিত হওযা চাই। সত্য কথা বলিতে কি, কোথায় আবম্ভ কবিতে হইবে এবং কোথায় থামিতে হইবে, এই শিল্প-দৃষ্টি যাহার নাই তাহার পক্ষে ছোটগল্প লেখা লাঞ্ছনা বই কিছুই নয়। স্বল্প-সংখ্যক সুনির্ব্বাচিত ঘটনাব সাহায্যে ইঙ্গিত-পূর্ণ পরিণতি লাভই ছোটগল্পের উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ, সাবাটী গল্পে লেখকেব যে মানস-স্পর্শ থাকে, তাহাই তাহাকে গীতি-কাব্যোচিত মাধুর্য্য দান করে। উপন্যাস বা নাটকে পবিতৃপ্তি আছে, ছোটগল্পে ইঙ্গিত-মধুরতা আছে। অথচ, এই ছোট কলেবরের মধ্যে নিগূঢ় সত্যের ব্যঞ্জনাবই ইহার পবিপূর্ণতা। ছোটগল্পের প্রকৃতি ও গঠন-রীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আপনার অজানিতে যেন বলিযা ফেলিয়াছেন—

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটী অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হ'য়ে হইল না শেষ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছোটগল্প লেখকের আত্ম-সচেতন সৃষ্টি। এই জাতীয় সাহিত্যে বিশেষ প্রকারের গঠনরীতি, বিষয়বস্তু-চয়ন, চরিত্র-সৃষ্টি, কথোপকথন, পবিবেশ-সৃষ্টি, বাণীভঙ্গি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

ছোটগল্প

ছোটগল্পে লেখক পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভূতি অথবা অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতে পারেন, কিন্তু সকল সময়ই তাহাকে বিশেষ একটী রস-পরিণামকে (*Unity of Effect*) মুখ্য করিতে হইবে; সুতবাং যে-কোন অবান্তর কাহিনী বা রসভঙ্গকারী ব্যাপার সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। লেখক ব্যঞ্জনাত্মক সূচনা হইতে গল্পের জাল বুনিয়া যাইবেন, এবং উহা যেন স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে। Plot বা বিষয়-বস্তু বিশেষ কোন চরিত্রের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে। লেখক স্বাতন্ত্র্য-বিশিষ্ট কয়েকটী চরিত্র দুই একটী রেখায় বা ইঙ্গিতে আঁকিয়া যাইবেন। সাবলীল, গতিশীল, স্বচ্ছ কথোপকথনের মধ্য দিয়া চরিত্র সৃষ্টি করা লেখকের উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। গল্পের চরিত্রগুলির কথাবার্ত্তা যেন পরস্পরের, এমন কি তাহাদের নিজের উপরও আলোকপাত করে, এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পরিমিত বর্ণনা দ্বারা লেখক পরিবেশ বা আবহাওয়া সৃষ্টি করিবেন। কোন কোন গল্পে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য (*Local Colour*) ফুটাইতে হইলে লেখক স্থান-বৈশিষ্ট্য নিষ্ঠার সহিত বর্ণনা করিবেন। গল্পের বাণী-ভঙ্গি বিশিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইজন্য শব্দচয়ন, উপমা বা অলঙ্কার-প্রয়োগ এবং ভাব ও বিষয়ানুযায়ী ভাষা ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিধেয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে সর্ব্বোপরি উহার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা-দীপ্তির উপর।

উপন্যাস ও ছোটগল্প

উপন্যাস ও ছোটগল্পের পার্থক্য শুধু আকৃতিগত নহে, প্রকৃতিগতও, এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমি ইহার উপযোগী নহে, কারণ ছোটগল্প-লেখক সমগ্র জীবনের রূপ দান করেন না। ছোটগল্প স্বয়ং সম্পূর্ণ এক প্রকার শিল্প-সৃষ্টি—ইহার পৌর্ব্বাপর্য্য নাই, ইহা জীবনের খণ্ডাংশের মহিমোজ্জ্বল কান্তি। অবশ্য, উপন্যাসে যত বিষয়ে আলোচনা হইতে পারে, এইখানেও তাহা সম্ভব, কিন্তু ছোট পরিধির মধ্যে। উপন্যাস বিস্তৃত, ছোটগল্প সংহত; উপন্যাসে পরিতৃপ্তি, ছোটগল্পে ব্যঞ্জনার অতৃপ্তি।

উপন্যাস পাঠককে সবই বুঝাইয়া দেয়, ছোটগল্প তাহাকে বুঝিবার অবকাশ দেয। সুতরাং, যে-লেখক বৃহৎ আখ্যান-রচনায় সিদ্ধহস্ত, যিনি বহুবিধ চবিত্র-সৃষ্টিতে নিপুণ, এবং জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনায় অনলস, তাঁহার পক্ষে ছোটগল্প-লেখক না হইয়া ঔপন্যাসিক হওয়া শ্রেয়ঃ। কিন্তু যিনি আখ্যানভাগ অপেক্ষা চরিত্র-সৃষ্টিতে অধিকতর পটু, যাহাব পরিতৃপ্তি অপেক্ষা ইঙ্গিতের দিকেই লক্ষ্য বেশী, তাহার পক্ষে উপন্যাস না লিখিয়া ছোটগল্প লেখাই বিধেয়। এইজন্য যাহারা আত্মভাবপরায়ণ, তাহাদের ছোটগল্প যতখানি রস-নিবিড় হয, অপরের ততখানি হয় না।

বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যে ছোটগল্প

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, ছোটগল্পের সহিত আমাদেব দেশের সঙ্কীর্ণ-পরিসর বৈচিত্র্যহীন জীবন-যাত্রার একটী স্বাভাবিক সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আছে। ইহা যেমন আমাদের সমাজ সম্বন্ধে খাটে, তেমনি আর একটী সাধারণ কারণ আছে, যে জন্য ছোটগল্পের প্রচলন সহজ হইয়াছে। আধুনিক যুগের মানুষেব জীবনে অবসর কম, কাজ বেশি। সুতরাং ইহারই মধ্যে আনন্দ পাইতে হইলে তাহাকে ২০০—২৫০ পৃষ্ঠার উপন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। ইংরেজী, ফরাসী, রুষীয় এবং আমেরিকান সাহিত্যে অতুলনীয় ছোটগল্প আছে। ইংরেজীতে ষ্টিভেন্‌সন্, হেনরী জেম্‌স্, ওয়েল্‌স্, বেনেট্, ক্যাথারিন ম্যান্‌সফিল্ড্, গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি, ডি. এইচ. লরেন্স; ফরাসীতে মোঁপাসা, ব্যালজাক; রাশিয়ার গোগল, শেখভ, আন্দ্রিভ্, টলষ্টয়; আমেরিকার ই. এ. পো, ব্রেট্‌হার্ট প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখক।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে ছোটগল্প লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গল্প আধুনিক ছোটগল্প বলিতে যে শিল্প-সৃষ্টি বুঝি, তাহা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের পথ-প্রদর্শক ও শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। 'আমাদের এই বাহ্যতঃ তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জীবনের তলদেশে যে একটী অশ্রুসজল ভাবঘন গোপন প্রবাহ আছে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য স্বচ্ছ অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেগুলিকে

আবিষ্কার করিয়া পাঠকের বিস্মিত মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন।'* তাঁহার কোন কোন গল্পে হাস্যরস বা কৌতুকপ্রিয়তা, কোথাও জীবনের গভীর সকরুণতা বা খণ্ডক্ষুদ্র ভুলভ্রান্তি অসামান্য কবিত্ব-সৌন্দর্য্য মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। একটী মাত্র ভাবের সুব যেন তাঁহাব গল্পকে কাব্যিক অনুভূতির মৃদু প্রলেপে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে গীতিকবিতার মাধুর্য্য দান করিয়াছে। ফলে, তাঁহার অধিকাংশ গল্প গীতিকাব্যধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের কুশ্রীতা নগণ্যতা রবীন্দ্র-কবিদৃষ্টিতে বিধৌত হইয়া যে নির্ম্মল বসচেতনায় একাকাব হইয়া উঠিয়াছে, সেই শ্রেণীব রসচেতনা পরবর্ত্তী বাংলা গল্প-সাহিত্যে দেখা যায় না। একমাত্র শবৎচন্দ্রেব ছোটগল্পে বাংলার বঞ্চিত বেদনা ভাষা পাইয়াছে এবং গল্পগুলি যেন হৃদয়াবেগেব প্রেরণায় মর্ম্মস্পর্শী মূর্ত্তি লাভ করিয়া মানবতা বা মনুষ্যত্বের স্তুতিরূপে উর্দ্ধায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাধনার মধ্যবর্ত্তীকালে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাব গল্পে জীবনের ছোটখাটো ঘটনা হাস্যোজ্জ্বল কৌতুকরসিকতাব সংযত অথচ লঘুকোমলস্পর্শে বিচিত্র রূপ লাভ করিয়াছে। প্রভাতকুমাব গভীর বা মর্ম্মস্পর্শী বা একান্ত আত্মকেন্দ্রিক গীতিকাব্যধর্ম্মী না হইলেও, ছোটগল্পে একটী সহজ অথচ বিস্ময়কর এবং অভ্রান্ত পরিণতির অর্থ-ব্যঞ্জনা ও রূপকথা-সুলভ ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করিতে তাঁহার ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। তাঁহার সূক্ষ্ম সংযমজ্ঞান ও স্বাভাবিকতাবোধই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। গল্প-সাহিত্যে বিশিষ্ট দৃষ্টি ও বাণীভঙ্গির পরিচয় দিয়াছেন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে বলেন, 'গল্প-সাহিত্যে তিনি ঐশ্বর্য্য দান করেছেন। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে মিলেছে তাঁর অভিজাত মনের অনন্যথা, গাঁথা হয়েছে ভাষার শিল্পে' পরবর্ত্তীকালে ভাবদৃষ্টি নয়, বাস্তবদৃষ্টিই গল্পের ভূষণরূপে পরিগণিত হইয়াছে এবং মানুষ অপেক্ষা মানুষের সমাজই গল্পলেখকদের কাছে বড় হইয়া উঠিয়াছে।

* ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বাংলা উপন্যাসের ধারা

এই ধরণের বাস্তবদৃষ্টি ও বস্তুতন্ত্রের সূত্রপাত শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি সংক্রান্ত গল্পেই প্রথম দেখা যায়। তারাশঙ্কর ও সরোজকুমার শৈলজানন্দের ধারারই অনুপন্থী হইলেও তারাশঙ্করের গৌরব ইহাদের অপেক্ষা বেশি। আধুনিক বাস্তবতামূলক সমস্যাকে গ্রহণ করিলেও তারাশঙ্কর ইহারই মধ্য দিয়া মনুষ্যত্বের গভীর রহস্যকে স্পর্শ করিয়াছেন। তাঁহার 'জলসাঘর' ও 'রসকলি' সার্থক সাহিত্য-রচনার নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে পারে। তারাশঙ্করের ছোটগল্প ও উপন্যাসের অন্যতম বিষয় বিলীয়মান মধ্যযুগীয় জমিদারী বংশ। আধুনিক কালের সংস্পর্শে এই মধ্যযুগীয় সভ্যতার পরাজয় যেমন তারাশঙ্করের দৃষ্টির যথার্থতা প্রতিপন্ন করে, নূতন সভ্যতাকে গ্রহণ করিবার ঔদার্য্য এবং আধুনিকতাও তেমন তাঁহার প্রতিভার বিশিষ্টতাকে প্রতিপন্ন করে। কিন্তু মানবজীবনের 'বিন্দুবিসর্গ' অবলম্বনে 'বনফুল' যে-শ্রেণীর নাতিদীর্ঘ অপরূপ ব্যঞ্জনা-দীপ্ত গল্পরচনা করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে তাহা অতুলনীয়।

রোমান্টিক কল্পনা-স্নিগ্ধ সুকুমার গল্পরচনায় মণীন্দ্রলাল বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোজ বসু দক্ষতা দেখাইয়াছেন। বাংলার প্রকৃতিকে রোমান্টিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিবার যে নৈপুণ্যের পরিচয় বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়াছেন তাহাই তাঁহার খ্যাতি অনির্বাণ রাখিবে। পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবতানিষ্ঠ গল্পলেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেন ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে বুদ্ধদেবের আদর্শ ডি. এইচ. লরেন্স ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ ব্যাল্‌জাক্। হাস্যরসাত্মক গল্পরচনায় রাজশেখর বসু, বিভূতি মুখোপাধ্যায় ও অমূল্য দাশগুপ্ত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' ও 'পরশুরামের কুঠার' বাংলা গল্প-সাহিত্যে একটী বিশেষ স্তর সূচনা করিতেছে। মানুষের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণে তিনি কঠোর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্ম্মম সততার পরিচয় দিয়াছেন।

প্রবন্ধ-সাহিত্য

গদ্য সাহিত্যে প্রবন্ধের একটী বিশিষ্ট স্থান আছে, এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। Saintsbury প্রবন্ধকে *'work of prose art'* বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণতঃ, কল্পনা ও বুদ্ধি-বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া লেখক কোন বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্য-রূপ সৃষ্টি করেন, তাহাকেই প্রবন্ধ বলা হয়। প্রবন্ধের ভাষা ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনার পর ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে যে, ইহা সাধারণতঃ গদ্যে, এবং নাতিদীর্ঘ করিয়া লিখিতে হইবে। অবশ্য, Locke-এর *An Essay on the Human Understanding,* Mill-এর *Liberty,* বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' বা 'কমলাকান্তের দপ্তর', এবং শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' পড়িলে মনে হইবে যে, দৈর্ঘ্য ইহার পক্ষে অশোভন নয়। Pope-এর *Essay on Man* বা সুরেন্দ্র মজুমদারের 'মহিলাকাব্য' কবিতাকারে প্রবন্ধ বিশেষ। সুতরাং প্রবন্ধ কবিতায় লেখা যাইতে পারে না, বা হয় না— এমন কথা বলাও সঙ্গত হইবে না। অবশ্য, গদ্যে লিখিবার রীতিটীও নেহাৎ মামুলীপ্রথা ছাড়া কিছুই নয়।

প্রবন্ধ

সাহিত্যের যাহা চিরন্তন উদ্দেশ্য—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও আনন্দদান, তাহাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ইহা বলাই বাহুল্য। তবে, বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ আমাদের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর ও দৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলে ও মন্ময় বা 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধ জ্ঞানের বিষয়কে হাস্যরসমণ্ডিত পুষ্প-পেলবতা দান করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করে। *'Wisdom in a smiling mood'*-ই এই জাতীয় আধুনিক প্রবন্ধকারের বিশেষত্ব। অধিকন্তু, শেষোক্ত শ্রেণীর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠকের চারিদিকে একটী নিভৃত ভাবমণ্ডল (*atmosphere*) সৃষ্টি করে। উহাতে লেখকের কম্পমান ব্যক্তি-চিত্ত অসীম আকূতি রূপে পাঠকের প্রাণস্পর্শ করে।

বিষয়মাত্রই চিরপুরাতন ও সীমাবদ্ধ; ভঙ্গিই তাহাকে চলিষ্ণু ও প্রাণবান করিয়া তোলে। প্রবন্ধ সাহিত্যের বিচারে তাই এই বিষয়বস্তু ও বলিবার ভঙ্গির কথাই মুখ্য। বিষয়বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার করিয়া যে সকল বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখিত হয় তাহাদিগকে **তন্ময়** বা **বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ** বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর প্রবন্ধ কোন সুনির্দ্দিষ্ট সুচিন্তিত চৌহুদ্দি বা সীমারেখার মধ্যে আদি, মধ্য ও অন্ত সমন্বিত চিন্তা-প্রধান সৃষ্টি। লেখক 'গরু' সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়া 'গোপালক' সম্বন্ধে একটী কথাও ইহাতে বলিবেন না। কারণ, তাহাকে অতিমাত্রায় সংযত ও নিষ্ঠাবান হইতে হইবে। ইহাতে লেখকের পাণ্ডিত্য বুদ্ধি বা জ্ঞানের পরিচয়ই মুখ্য হইয়া উঠে। লেখকের যে-ব্যক্তিত্বের পরিচয় এইখানে থাকে, তাহার সহিত পাঠকের বুদ্ধির যোগ হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের সহিত কোন সংযোগ সাধিত হয় না। লেখক অধিকাংশ সময় এই শ্রেণীর প্রবন্ধে তাহার জ্ঞানের পরিধি দেখাইয়া আমাদিগকে বিস্মিত করেন অথবা তাহার অনন্যসাধারণ চিন্তাশীলতা বা বুদ্ধির প্রখরতায় বিস্মিত করেন। তাহার স্থান পাঠকের সহিত একাসনে নহে, তিনি যেন বেদীর উপর সমাসীন আচার্য্য বা গুরুদেবের মত পাঠককে নেহাৎ অপোগণ্ড শিশু মনে করিয়া জ্ঞানের আলোকণিকা বিতরণ করেন। এই প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রবন্ধ :
শ্রেণী-বিভাগ

কিন্তু আর এক শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে যেখানে লেখকের ব্যক্তি-চিন্তা অপেক্ষা ব্যক্তি-হৃদয় প্রধান। ইহাদিগকে **মন্ময়** বা **ব্যক্তিগত প্রবন্ধ** নামে অভিহিত করিতে পারি। ইহারা বস্তুনিষ্ঠ নয়, ব্যক্তিনিষ্ঠ; চিন্তাপ্রধান নয়, ভাবপ্রধান। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ আমাদের বুদ্ধি চিন্তা বা জ্ঞানের খোরাক প্রদান করে, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবন্ধ জ্ঞানের বিষয়কে পর্য্যন্ত লঘুকল্পনা-প্রদীপ্ত করিয়া উহার হাস্যোচ্ছলরূপে আমাদিগকে মুগ্ধ করে। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ গুরুগম্ভীর প্রশ্ন বা জীবনসমস্যা লইয়া সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া মীমাংসার সন্ধান করিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বিষয়বস্তুর

গাম্ভীর্য্যকে লেখকের অতি অকপট ও নিবিড় ভাবরসে স্নিগ্ধ করিয়া আমাদের চারিদিকে সুন্দর শান্ত ও কান্ত একটী ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করে। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখকের বিচারবুদ্ধি ও চিন্তাশীলতা প্রধান, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখকের অনুভূতি-স্নিগ্ধ সরস হাস্যমধুর আত্মস্পর্শ প্রধান। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক নিজেকে পাঠকের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেন, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখক পাঠকের সহিত অভিন্নাত্মা হইয়া, একান্ত আপনার জনের মত আপনার কথাটী বলিয়া যান। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক আত্মপ্রচার করেন, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে আত্মনিবেদন করেন; একজনকে আমরা শ্রদ্ধা করি, আর একজনকে আমরা ভালবাসি। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের আলোকে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইতে পারে, ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মৃদু আলোকরেখায় আমরা একটী বিশেষ লোককে চিনিতে পারি, এবং সেই 'আলোকে নিজেরে চিনি'। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সাধারণতঃ গুরুগম্ভীর এবং চিন্তাপ্রধান; কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আকাশের তারকা হইতে মাটির প্রদীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং পরমপিতা পরমেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া দীনতম উপলখণ্ড পর্য্যন্ত ইহার বিষয়ীভূত হইতে পারে। সেইজন্য Robert Lynd বলেন—

'Sometimes it is nearly a sermon, sometimes it is nearly a short story. It may be a fragment of autobiography, or a piece of nonsense. It may be satirical or vituperative or sentimental. It may deal with any subject from the Day of Judgement to a pair of scissors'.

অতি পুরাতন, অতি পরিচিত বিষয়কে এই শ্রেণীর প্রবন্ধবিদ্ আত্মনিষ্ঠ কল্পনাদ্বারা রঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করেন, কারণ বলিবার ভঙ্গিটাই তাঁহার নিকট চরম। এই শ্রেণীর প্রবন্ধবিদ্ একান্তভাবে আত্মনিষ্ঠ, অকপট ও খেয়ালী। সুনির্দ্দিষ্ট সীমার বন্ধন তাঁহার পক্ষে বরং পীড়াদায়ক, তাই তিনি বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অবলীলাক্রমে পর্য্যটন করেন। এমনও হইতে পারে যে, প্রবন্ধকার 'হ্রদ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া সমুদ্র-

সন্দর্শন করেন, আবার সমুদ্র-স্নান শেষ করিয়া বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া 'বেলা যায়' কবিতা স্মরণ করেন। অথবা, 'ভুবনেশ্বরের মন্দির' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে ভুবনেশ্বরের 'নাক্সভমিকা' গাছের দিকে চাহিয়া তিনি নিজের অগ্নিমান্দ্যের কথা স্মরণ করতঃ হ্যানিম্যানের গুণকীর্ত্তন করেন; আবার, 'নাক্সভমিকা' হইতে 'চায়না'র গুণাগুণ বর্ণনান্তে সহসা যখন তিনি চীন-জাপানের রণোন্মত্ততায় নিজেকে হারাইয়া ফেলেন, তখনও আমাদের এতটুকু ক্লান্তি আসে না। (তাহার স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত অথচ আপাতঃ-অসংলগ্ন রস-কল্পনায়— ডাঃ জনসন্ যাহাকে *loose sally of the mind* বলেন— আমরা বিস্মিত ও আনন্দিত হই।)

আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে যে-ধরণের মন্ময় প্রবন্ধের বিস্ময়কর প্রাচুর্য্য, সে-ধরণের প্রবন্ধ বাংলায় নাই বলিলেই চলে। বাংলায় এই জাতীয় প্রবন্ধের দৈন্যের যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস। বাঙ্গালী সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ ও অধ্যাত্মবাদী। জীবনকে সহজ সবল রস-দৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ করিতে যেন আমাদের প্রাণ সায় দেয় না। জীবনকে গভীর করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি যেমন আমাদের জাতিগত দার্শনিকতার পরিচায়ক, জীবনের আনন্দ-বেদনাকে লঘুকান্তি-হাস্যোজ্জ্বল করিয়া দেখিবার অক্ষমতাও আমাদের জাতীয় জীবনে হাস্যরসের একান্ত অসদ্ভাবের পরিচায়ক। এইজন্যই আমাদের দেশে Lamb, Chesterton, Alpha of the Plough বা Jerome. K. Jerome-এর মত প্রবন্ধ লেখা তেমন চলিতেছে না। আর একটী কারণেও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ আমাদের দেশে হইতেছেনা। আমাদের দেশে কোন লেখক ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে রস-সাহিত্য সৃষ্টি করিলে অনেকেই তাঁহাকে ভুল বুঝিতে পারেন। বাঙ্গালী পাঠক সাধারণতঃ লেখকের মধ্যে আদর্শের মহিমা সন্ধান করেন; লেখকও যে দোষেগুণে মানুষ, এবং তাঁহার ব্যক্তি-চরিত্রের দুর্ব্বলতা-প্রসূত রস-সৃষ্টিও যে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবার যোগ্য, এই কথা অনেকেই ভাবিয়া দেখেননা।

প্রবন্ধের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্ব-সৌরভ সঞ্চার করিবার ক্ষমতার উপরই ব্যক্তিগত প্রবন্ধের উৎকর্ষ নির্ভর করে। লেখক গীতিকবির ন্যায় আত্মসচেতন ও অহংবিদ্ধ কল্পনাপ্রবণ। তাই বলিয়া তাঁহার অহমিকা পাঠককে পীড়া দেয় না, তাঁহার সহিত আত্মীয়তা সৃষ্টি করে। এবং লেখকের ব্যক্তিগত ভাবনা কামনা ও জীবনদর্শন এমন ভাবে প্রবন্ধে রূপায়িত হইয়া উঠে যে, পাঠক উহাকে নিজের ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়। তাঁহার হাসি পাঠককে হাসায়, তাঁহার বেদনা পাঠকের চিত্তেও কৃষ্ণ রেখা টানিয়া দেয়, এবং তাঁহার প্রেমকাহিনী পাঠককে প্রেমোৎফুল্ল করিয়া তোলে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ এমন গভীরভাবে আত্ম-ধ্যানমূলক বলিয়াই ইহাকে অনেকে *Lyric in prose* বা গীতিধর্ম্মী গদ্যরচনা নামে অভিহিত করেন।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও অন্যান্য সাহিত্যিক রূপ-কর্ম্ম

এই প্রসঙ্গে অন্যান্য সাহিত্যিক রূপকর্ম্মের সহিত ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পার্থক্য বুঝিযা লওয়া দরকার। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ-শিল্পী রোমান্স স্রষ্টা নহেন। কাবণ, রোমান্সের উপজীব্য অসম্ভব ও কাল্পনিক বিষয়বস্তু; ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু জীবনের বাস্তবানুভূতি। ঐতিহাসিক যেমন জীবনকে ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়া দেখেন, এই শ্রেণীর প্রবন্ধ-শিল্পী তেমনটি দেখেন না। জীবনের সীমাহীন ঘটনাপুঞ্জের যে কোন একটাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। দার্শনিক যেমন জীবনের পরম সত্য উদ্‌ঘাটনে আত্মনিয়োজিত, তিনি তদ্রূপও নহেন; ঔপন্যাসিক যেমন জীবনের বর্ণনাত্মক রূপসৃষ্টি করেন, তিনি তাহাও করেন না এবং নাট্যকারের মত জীবনকে কর্ম্মময় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়াও প্রকাশ করেন না। কিন্তু তাঁহাব আত্মধ্যানে ইহাদের প্রত্যেকেরই স্পর্শ থাকিতে পারে। জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে সুরসঙ্গতি সন্ধান তাঁহার কাম্য নয়—তিনি শুধু অপরূপ জীবনকে দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া যান, এবং অপরূপের সৌন্দর্য্য যেখানে যতটুকু ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাই গ্রহণ করেন এবং জীবনের আশাআকাঙ্ক্ষার ও বেদনামধুরতার বিস্ময়-রহস্যকে আপন মনের মমতা-মেদুব মৃদু আলোক-সম্পাতে উজ্জ্বল করিয়া তোলেন।

শ্রীরামপুরের মিশনারীগণই প্রথমে ধর্ম্মপ্রচারার্থে প্রবন্ধ-সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা ব্যাহত করিবার জন্য রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪—১৮৩৩) বেদান্তসূত্র (১০১৫) প্রকাশিত হয়। মার্শম্যান, কেরী, রবিনসন্, পিয়ার্সন প্রভৃতি মিশনারীগণ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বাকবিতণ্ডায় যোগদান করিতে গিয়া শিক্ষা বা ধর্ম্মমূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৮১৭ সালে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্তচন্দ্রিকা' অনেকাংশে প্রবন্ধ লক্ষণাক্রান্ত। এই যুগের অন্যান্য প্রবন্ধসাহিত্যের মধ্যে কিমিয়া বিদ্যারসার, ঐন্দ্রজালের ইতিহাস, জ্যোতিষ গোলাধ্যায়, ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, বিজ্ঞানসেবধি প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। তবে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ বা রামমোহন যে-ধরণের প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্যগুণোপেত নয় বলিয়া প্রবন্ধ-সাহিত্যে ইহাদের মূল্য ঐতিহাসিক মাত্র।

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য

ইহাদের পর অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০—১৮৮৭) চারুপাঠ (তিন খণ্ড), বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রভৃতি প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক এবং তাঁহার ভাষা লালিত্যপূর্ণ না হইলেও সবল এবং সহজবোধ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের (১৮২০—৯১) 'আত্মচরিতে' তাঁহার ব্যক্তি-হৃদয় সাবলীল ও প্রসাদগুণসম্পন্ন হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫— ৯৪) 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'সামাজিক প্রবন্ধ' সহজ সবল পরিচ্ছন্ন ভাষায় লোকশিক্ষার উপযোগী প্রবন্ধ গ্রন্থ। হাস্যপরিহাসকুশল রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬—১৯০০) 'সেকাল আর একাল', রামগতি ন্যায়রত্নের (১৮৩২—৯৫) সমালোচনামূলক 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮—৯৪) ধর্ম্ম, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সমালোচনা প্রভৃতি নানাবিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার

'বিবিধ প্রবন্ধ' ও 'কমলাকান্তেব দপ্তর' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের মিতাক্ষরগাঢ় ভাষা আজ পর্য্যন্ত বাংলা গদ্য-সাহিত্যে তুলনাহীন। দার্শনিক প্রবন্ধ হিসাবে দ্বিজেন্দ্র ঠাকুরের (১৮৪০—১৯২৬) 'তত্ত্ববিদ্যা' ও 'গীতাপাঠের ভূমিকা' উল্লেখযোগ্য। কালীপ্রসন্ন ঘোষের (১৮৪৩—১৯১০) চিন্তামূলক 'প্রভাত চিন্তা' 'নিশীথচিন্তা' 'নিভৃতচিন্তা' এবং হাস্যরসাত্মক 'প্রমোদ লহরী' ও 'ভ্রান্তিবিনোদ' প্রবন্ধ-সাহিত্যে স্মরণীয়। কালীপ্রসন্নের ভাষা ওজস্বিনী ও তাঁহার প্রবন্ধ বহুশ্রুতত্বের পরিচায়ক। চন্দ্রনাথ বসুর (১৮৪৫—১৯১১) শকুন্তলাতত্ত্ব', 'সংযমশিক্ষা' ও 'ত্রিধার' মূল্যবান প্রবন্ধ পুস্তক। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩—১৯৩১) শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধমালা এবং 'তৈলদান' নামক লঘু রস প্রবন্ধটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই যুগের অন্যান্য প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধ্যাত্ম উপলব্ধি-মূলক 'ব্রাহ্মধর্ম্মেব ব্যাখ্যান', রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'নানাপ্রবন্ধ', ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়েব 'অভয়ের কথা' ও রজনী গুপ্তের 'আর্য্যকীর্ত্তি' শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। ইঁহাদের পর রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১)। সাহিত্য বিজ্ঞান, স্বদেশ, ধর্ম্ম, সাহিত্য-বিচার প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে কোথাও তত্ত্ব, কোথাও তথ্য, আবার কোথাও অনুভূতি বা যুক্তি-নিষ্ঠা মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই রবীন্দ্র-মানসেব বিশিষ্ট কবি-দৃষ্টি প্রবন্ধকে কাব্য-শ্রী দান কবিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠে আমরা বিস্মিত, মুগ্ধ ও বিমোহিত হই, কিন্তু কখনো রবীন্দ্রনাথের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিজের সুখদুঃখের ভাগী হইতে পারি না। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে যে হৃদয়ের স্পর্শ থাকে, তাহা অপেক্ষা বুদ্ধির দীপ্তি ও ভাবৈশ্বর্য্যের সূক্ষ্মতাই তাঁহার প্রবন্ধে বেশি পরিলক্ষিত হয়। একমাত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব (১৮৭০—৯৯) প্রবন্ধে একটী নিরাভরণ সলজ্জ ব্যক্তি-সৌরভ আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষায় রূপ পাইয়াছে। রবীন্দ্র-যুগের অন্যান্য প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪—১৯১৯)। 'চরিত কথা', 'কর্ম্মকথা', 'জিজ্ঞাসা',

জগদানন্দ রায়ের 'আলো', 'প্রকৃতি পরিচয়', জগদীশ বসুর 'অব্যক্ত', ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব ও রস-প্রবন্ধ 'রসকরা', 'ব্যাকরণ বিভীষিকা' উল্লেখযোগ্য। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের প্রবন্ধ-সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথম চৌধুরীর (১৮৬৮—১৯৪৬) হাস্যরসাত্মক সূক্ষ্ম বুদ্ধিনিষ্ঠ প্রবন্ধাবলী, মোহিতলালের সমালোচনামূলক প্রবন্ধাবলী, ও রাজশেখর বসুর কয়েকটী প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আমাদের জীবনের ও পারিপার্শ্বিকের দীনতম ও নগণ্য জিনিষকে কেন্দ্র করিয়া ব্যক্তিগত প্রবন্ধে হাল্‌কা সুরে গভীর কথা বলিবার অনুপম ভঙ্গিটী, আধুনিক কালের দুই একজনের লেখায়ই সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে।

১০

সমালোচনা

সাহিত্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচারমূলক সম্যক আলোচনাকে সাধারণভাবে সমালোচনা নামে অভিহিত করা হয়। সম্যক আলোচনা বলিতে সাহিত্যের ভাব বস্তু রীতি অলঙ্কার প্রভৃতির সামগ্রিক আলোচনাকেই বুঝায়। সাহিত্য-সমালোচনা এত বিভিন্ন পদ্ধতিতে অনুসৃত হয় এবং একই সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক সময় দুইজন মনীষীর এত মতানৈক্য দৃষ্ট হয় যে, উহার কাব্য-কীর্ত্তি সম্বন্ধে কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া অনেক সময় কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। সমালোচনার ক্ষেত্রে এই মতবিরোধের কারণ বোধ হয় এই যে, দুইজন লোক শিক্ষা দীক্ষা ও জ্ঞানগরিমায় তুল্য হইলেও তাঁহাদের রুচির পার্থক্য হওয়া অসম্ভব নয়। আর একটী কারণেও উক্ত মতদ্বৈধতা হওয়া অসম্ভব নয়। সমালোচকের যতগুলি গুণ থাকা দরকার তন্মধ্যে সহৃদয়তা ও উদারতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সমালোচনা ও সমালোচক

ইহার অভাবে অনেক পুঁথিগত সমালোচক সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া শুধু ব্যক্তিগত মতামতকে সমালোচনার নামে চালাইতে চাহেন। এই ধরণের সমালোচনার কোন মূল্য না থাকিলেও, মোটের উপর, সমালোচনার প্রযোজনীয়তা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। সত্যকার সমালোচনা পথভ্রষ্ট সাহিত্যিককে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাকে দৃষ্টিদান করে, এবং সাধারণ পাঠকেব দৃষ্টি শাণিত, ও অনুভূতি জাগ্রত করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সহৃদয়তা ও উদাবতা সমালোচকের শ্রেষ্ঠ গুণ। সহৃদয়তা ব্যতীত কোন কবি বা সাহিত্যিক জীবনের যেই রূপটী যেমন করিয়া দেখিয়াছেন, সেই রূপটী তেমন করিয়া দেখা সম্ভব হয় না; এবং উদারতা না থাকিলেও কোন সাহিত্যের মর্ম্মমূলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা সহজসাধ্য হইতে পারেনা। এতদ্ব্যতীত, সমালোচককে শিক্ষিত, সংস্কৃতিমান ও সাহিত্যবোধ সম্পন্ন হইতে হইবে। এই সাহিত্যবোধ সাধারণতঃ শিক্ষার দ্বারা সঞ্চারিত হয় না, ইহা অনেকটা প্রাক্তন।

সাহিত্যে যেমন গ্রন্থকারের আত্ম-প্রকাশ, সমালোচনায়ও তেমন সমালোচকের আত্মমুক্তি। এই আত্মমুক্তির মধ্যদিয়া সমালোচক পাঠককে 'লেখকেব মনেব সহিত পরিচয' করাইয়া দেন। কিন্তু এই আত্মমুক্তি নিছক ব্যক্তিগত নয়; ব্যক্তিগত কাব্যানুভূতি যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বমানবের প্রত্যয়-আলোকে বিভাসিত নব-সৃষ্টিতে মূর্ত্ত না হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা সত্যকাব সমালোচনার পর্য্যায়ে উন্নীত হয় না।

সমালোচনা সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত যে সকল পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটী নিম্নে আলোচনা করা হইল—

(১) **আলঙ্কারিক পদ্ধতি**—কাব্যবিচারে যাহারা কাব্যের শব্দ ও অর্থালঙ্কারের আস্বাদন করেন, তাঁহারা এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। ইঁহাদের মতে কাব্যের প্রয়োজনীয়তা শুধু উহার অলঙ্কারের চারুতায়। 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ'। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার কাব্যের ষ্টাইল্ বা রীতি বিচারের উপর জোর দিয়া থাকেন। কারণ,

ইহাদের মতে 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। এইরূপ বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইহা সাহিত্যকে সমগ্রতায় দেখে না; ইহা ভুলিয়া যায় যে, সাহিত্যের বিষয়বস্তু যে বিশিষ্ট সালঙ্কাব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, উহার সর্ব্বাঙ্গীণতা অবিভাজ্য।

(২) **ঐতিহাসিক পদ্ধতি**—যে সমালোচনা যুগচিত্ত, পারিপার্শ্বিক ও গ্রন্থকাবের ব্যক্তি-মানস কাব্যবিশেষে কতখানি মূর্ত্ত হইয়াছে, ইহার বিচার করে, তাহা ঐতিহাসিক পদ্ধতি শ্রেণীভুক্ত। যুগচিত্ত ও পাবিপার্শ্বিক গ্রন্থকাবেব ব্যক্তি-মানসকে প্রভাবিত করিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বিচাবেই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয না। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক যুগচিত্ত ও পারিপার্শ্বিককে নিজেব মনের জারক বসে রসায়িত করিয়া যে যুগ ও কালাতীত সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন, এই পদ্ধতি তাহা উপলব্ধি কবে না। এতদ্ব্যতীত, এই পদ্ধতি অনেক সময় অতিরঞ্জনের দ্বাবা কোন কোন কাব্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ কবিতে পাবে বলিয়া ইহা নিরাপদ নয়।

(৩) **সনাতনবিধি-সম্মত পদ্ধতি**—সাহিত্যবিচারে উহাব বহির্গত কতকগুলি সনাতন বা প্রাচীন নিযমাবলীর সাহায্যে সমালোচনা এই পদ্ধতিমূলক। এই পদ্ধতি অতিশয় বক্ষণশীল মনোবৃত্তি-সম্পন্ন এবং ইহা ভুলিয়া যায যে, সাহিত্য শুধু গ্রন্থকারেব ব্যক্তি-অনুভূতি ও সৃষ্টি-কর্ম্ম-নিয়মাধীন, এবং উহার বহির্গত নিয়মে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব নয়।

(৪) **মনস্তত্ত্বমূলক পদ্ধতি**—যে-সমালোচনা পদ্ধতি সাহিত্য-বিচারে গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবন বা তাঁহার নির্জ্জান মনের ছাপ সাহিত্যে কতখানি মূর্ত্ত হইয়াছে, ইহার বিচার করে, তাহা এই পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য, এই সমালোচনা সাহিত্যের নয়, বরং সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবন বা চরিত্রের সমালোচনা মাত্র।

(৫) **ব্যক্তিগত সমালোচনা**—যে সমালোচনায় গ্রন্থবিশেষ সমালোচকের নিকট কেমন লাগিয়াছে, এই কথাটাই বক্তব্য হইয়া

উঠে, তাহাকে ব্যক্তিগত সমালোচনা কহে। সাহিত্যবিচারে সমালোচকের ব্যক্তিগত ভাল-লাগা-না-লাগা কথাটী উপেক্ষনীয় নয় বটে, কিন্তু দেখিতে হইবে সমালোচকের শিক্ষা, সংস্কৃতি, দৃষ্টি, উদারতা ও সাহিত্যবোধ আছে কিনা। অধিকারহীন সমালোচকের সাহিত্যবিচার অনেক সময় লাঞ্ছনায় পর্য্যবসিত হইতে পারে এবং ব্যক্তিগত সমালোচনা অধিকাংশ সময় অতিরঞ্জনের প্রশ্রয় দিয়া থাকে।

(৬) **তত্ত্বসন্ধানী পদ্ধতি**—আলোচ্য সাহিত্য বা কাব্য কতখানি সমাজকল্যাণ সংসাধিত করে বা উহার মধ্যে কোন্ সত্য নিহিত আছে, অথবা উহার সৌন্দর্য্য বা রসতত্ত্বের স্বরূপই বা কিরূপ, যাহারা সাহিত্যবিচারে ইহাদের আলোচনা করেন, তাঁহারা এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, 'সাহিত্য ও কাব্যের লক্ষ্য সমাজহিত ... এ মত সত্যিকারের কাব্যপরীক্ষার ফল নয়; তথ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে একটা মনগড়া তত্ত্ব' *। এতদ্ব্যতীত, জীবন-স্পর্শ বর্জ্জিত নিছক সৌন্দর্য্য বা রসতত্ত্বের আলোচনা নন্দন-তত্ত্বের আলোচনার বিষয় হইলেও সাহিত্যে উহার প্রয়োগ আনুষঙ্গিক মাত্র। সাহিত্যে সত্যানুসন্ধানও যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ 'সত্য কাব্যের লক্ষ্য নয়, কাব্যের উপাদান' * মাত্র।

(৭) **বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি**— যে পদ্ধতি সাহিত্যকে সাহিত্য হিসাবে, বিশিষ্ট এবং একক সৃষ্টি-কর্ম্ম হিসাবে বিচার করে, তাহাকে বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। এই বিচারে বিশেষ কোন যুগ চেতনা সাহিত্যে মূর্ত্ত হইয়াছে কিনা, ইহা মোটেই মুখ্য নয়; প্রাচীন বিধি-সম্মত বিচারেও ইহা সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করে না; ইহাতে, গ্রন্থকারের ব্যক্তি-জীবন কতখানি সাহিত্যে প্রতিফলিত, এই কথাও মুখ্য নয়, অথবা সমালোচকের আত্মম্ভরী মূল্যনির্দ্দেশেরও এইখানে সুযোগ নাই। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য, কোন ব্যক্তি-বিশেষ জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বাহক ও ধারকরূপে জগত ও জীবনকে যে-রূপে দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার দৃষ্টিতে কতখানি

* শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত : কাব্য-জিজ্ঞাসা (দ্বিতীয় সংস্করণ)

স্বাভাবিক ও সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই বিচার। এই সত্যদৃষ্টি সাহিত্যকে বিষয়, ভাব ও রীতির একটী পূর্ণমণ্ডল, স্বয়ম্বশ রূপ-সৃষ্টি হিসাবে দেখিতে চেষ্টা করে। এইভাবে দেখিলে সাহিত্যের যে বিচার হয়, উহা মূলতঃ সাহিত্যের ব্যাখ্যা। রবীন্দ্রনাথও বলেন—

'সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যতঃ সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিংবা তাত্ত্বিক বিচার হোতে পারে। সে রকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই'।

ইহাতেই প্রতীতি হইবে যে, একান্ত বস্তু-নিষ্ঠ সমালোচনাও ব্যক্তি-নিষ্ঠ হইতে বাধ্য।* কারণ, ব্যক্তি-হৃদয় ব্যতীত বস্তু-সৌন্দর্য্যের কোন 'ব্যাখ্যাই' সম্ভব নয়। বস্তু-জগৎ যেমন কবি বা সাহিত্যিকের মনের পরশে রঙিন হইয়া কায়া-কান্তিময় হইয়া উঠে, সাহিত্যিকের রচনাও (যাহা সমালোচকের বস্তু-জগৎ) তেমন সমালোচকের মনের পরশে 'আরেকটু রঙিন' হইয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলাল, ভ্রমর, কুন্দ প্রভৃতি চরিত্র-সৃষ্টি করিয়াছেন; শরৎচন্দ্র দেবদাস, মহিম সুরেশ, রমা, অচলা, কিরণময়ী, কমল প্রভৃতি চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের সমালোচক আবার গ্রন্থকারের সৃষ্টির সাহায্যে স্বকীয় কবি-মানসের অভিনব রূপ-সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ, সমালোচক সর্ব্বমানবের প্রতিনিধি-রূপে সাহিত্যিকের রূপ-সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য-কল্পনাকে পাঠকের সম্মুখে প্রতিভাত করেন— এবং সাহিত্যের এই পরিচয়-প্রদান নব-সৃষ্টির মতই হইয়া উঠে। সমালোচক একান্তভাবে ব্যক্তি-নিষ্ঠ হইয়াও বহুর প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সাহিত্যিক যেমন সাহিত্যের মধ্য দিয়া আত্ম-মুক্তির সন্ধান করেন, সমালোচকও তেমনই অপরের সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত ধ্যানধারণাকে স্পষ্ট করিয়া তোলেন। কাব্যপাঠে পাঠক যে-আনন্দ পাইয়াছে, সমালোচনা যদি সে-আনন্দ দিতে পারে, তবেই

*Cf : 'There is no such thing as objective criticism, just as there is no such thing as objective art'—*Anatole France*

উহা সার্থক সমালোচনা। এই প্রসঙ্গে Middleton Murry-র মত প্রণিধানযোগ্য—

'If it (criticism) gives this delight criticism is creative, for it enables the reader to discover beauties and significances which he had not seen, or to see those which he had himself inglimpsed in a new and revealing light'.

সমালোচক ও সাহিত্য-স্রষ্টা

অনেকে মনে করেন, সমালোচক স্রষ্টা নহেন—অন্ততঃ, মূল সাহিত্যিকের তুলনায় তাহার স্থান অনেক নিম্নে।* লেখক জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছেন, তাহাকেই তাঁহার কাব্যে রূপ দেন। সুতরাং, তিনি স্রষ্টা, এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু লেখক যেমন আপনার মন দিয়া জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অনুভূত সত্য ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন, সমালোচক ও তেমন সাহিত্যিকের আন্তব সত্যটীকে নিজের মনের রস রসায়িত করিয়া নূতন সৃষ্টি করেন। অবশ্য, এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সমালোচক ও সাহিত্য-স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে একটু পার্থক্য আছে।* সাহিত্য-স্রষ্টার বিষয়বস্তু সীমাহীন, সমালোচকের বিষয়বস্তু সসীম। একজন নিজের ইচ্ছানুযায়ী গ্রহণ ও বর্জ্জনের দ্বারা জীবনেব রূপদান করেন, আর একজন রূপ-সৃষ্টি উপলক্ষ করিয়া নূতন সৃষ্টি করেন। এবং সমালোচকও ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার সাহায্যে, লেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা শুধু যাচাই-ই করেন না, তিনি যাহা লিখিতে পারেন নাই, বা যাহা তিনি বলিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহার সম্বন্ধেও ইঙ্গিত প্রদান করিয়া তাঁহার স্বকীয় অনুভূতি-সঞ্জাত জীবন-দর্শন গড়িয়া তোলেন। সাহিত্যিক জীবনের রূপ দান করেন, কিন্তু সমালোচক যেন সাহিত্যিকের হাতের কলমটি লইয়া বলেন, 'না, আপনি যে

* *Cf* "And yet the critic will do well to forego the claim of the creative artist………… He deals not in raw materials, as the artist does, but in the finished commodities"—***The Art and Craft of Letters.***

ভাবে বিষয় বা চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন, উহাতে তাহার স্বাভাবিক পরিণতি এমন বা তেমন হইবে—আপনি যাহা বলিতে চাহেন, তাহা হইতে পারে না'। অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই, সমালোচক দেখাইয়া না দিলে কোন্ কাব্য বা কাব্যাংশ কতখানি শ্রেষ্ঠ, তাহা আমাদের কাছে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না। সমালোচকই সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যকে উদ্ধার করিয়া পাঠকের বিস্ময়-সৃষ্টি কবেন ও আনন্দ বর্দ্ধন কবেন। এইজন্য আমরা বলিতে পারি যে, সাহিত্য-স্রষ্টার ন্যায় সমালোচকও 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' নূতনতর সৃষ্টি কবেন। এই সৃষ্টি তাঁহার আত্মাব প্রতিধ্বনির অনুরূপ—তাঁহার আত্ম-চরিতেব অংশ বিশেষ। সমালোচক তাঁহার অগ্রজ সাহিত্যিকের সৃষ্টির উপব নির্ভর করেন সত্য, কিন্তু রূপায়ন-দক্ষতা যদি তাঁহার থাকে, তবে তাঁহাকে স্রষ্টার সম্মান দান করিতে কাহারও কুণ্ঠার কারণ নাই।* শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক যেমন জীবন ও জগতের সত্যকে রূপদান কবেন, সমালোচকও তেমন বন্ধনবিমুক্ত মনোবৃত্তি ও দৃষ্টি দ্বারা 'নিতুই নব' সত্য ও সৌন্দর্য্য পাঠকের গোচর করেন। এইজন্য বলা যাইতে পাবে যে, সমালোচনা-প্রতিভা চিরচলিষ্ণু বিশ্ব-সৃষ্টি-প্রতিভারই অনুরূপ।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য অত্যন্ত দরিদ্র, সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধে শশাঙ্কমোহন সেন কয়েক বৎসব পূর্ব্বে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, 'তুলনা ব্যতীত প্রকৃত সমালোচনা নাই; বহুদর্শন ব্যতীত প্রকৃত তুলনা হইতে পারে না; আবার সহৃদয়তা ব্যতীত সমস্তই বিফল। বঙ্গীয় সমালোচনায় তিনেরই অভাব পরিদৃষ্ট হইবে' †। বাংলায় সমালোচনা-সাহিত্য ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছে, ইহাই আশার কথা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে সমালোচনা-সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উহা বড কাঁচা, বড় অপক্ক।

* *Cf:* 1. 'Valuing is *creating*'—*Nietzsche.* 2. 'A good criticism is as much a work of art as a good poem'—*M. Murry.*

† বঙ্গবাণী, পৃঃ ২০৯।

ইহার মধ্যে রসবোধের পরিচয় থাকিলেও সত্যকারের সমালোচনা-সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে ছিল না বলিলেই হয়। অবশ্য এই কথা স্বীকার্য্য যে, 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের প্রায় ২১ বৎসর পূর্ব্বে রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২১—৯১) সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) নামক মাসিক পত্রে সমালোচনার প্রথম সূত্রপাত হয়। এই কাগজে বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রভৃতি বহু লেখকের গ্রন্থ সমালোচিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ ইহার অধিকাংশই কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের লিখিত। সুতরাং তিনিই বাংলা সাহিত্যে আদি সমালোচক *। বিবিধার্থ সংগ্রহের' সমালোচনা-পদ্ধতি 'রহস্য সন্দর্ভ', 'সর্ব্বার্থ সংগ্রহ' ও ঢাকার 'মিত্রপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকায় অনুসৃত হইয়াছিল। ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত তৎকালীন সমালোচকদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, (১৮৪৬—১৯১৭), চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু 'বঙ্কিমচন্দ্রই (১৮৩৮—৯৪) বাংলায় সমালোচনা-সাহিত্যের অগ্রদূত। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সমালোচনাও সত্যকারের সৃষ্টি-মূলক সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হইতে পারে। তুলনামূলক সহৃদয় সমালোচনা তিনিই প্রথম সৃষ্টি করিলেন। 'উত্তরচরিত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা মিরন্দা ও দেসদেমোনা', 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব', 'দীনবন্ধুর কবিত্ব' প্রভৃতি সমালোচনা নিবন্ধে যে অন্তর্দ্দৃষ্টি, বহুশ্রুতত্ব, বিচারবুদ্ধি ও রসগ্রাহিতার পরিচয় পাই, তাহা বাঙ্গালা সমালোচনা-সাহিত্যের দিগ্দর্শনী হইয়া রহিয়াছে' †। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িককালে লিখিত বীরেশ্বর পাঁড়ের 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত (১৮৯৭), পূর্ণচন্দ্র বসুর 'সাহিত্যচিন্তা' (১৮৯৬) ও গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'বঙ্কিমচন্দ্র' সমালোচনা-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা সাহিত্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন। তিনি একদিকে যেমন লেখকের মনটীকে পাঠকের

* সমালোচনা-সংগ্রহ (*C. U.*)

† মজুমদার ও দাশ : বঙ্কিম-স্মৃতি

সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন, তেমন আবার সৃষ্টি-মূলক সমালোচনার ক্ষেত্রেও বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্যেও তাঁহার কবি-মনের পরিচয়টী সুস্পষ্ট। প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, সাহিত্য ও সাহিত্যের পথে তাঁহাব বিখ্যাত সমালোচনা গ্রন্থ।

রবীন্দ্রযুগের অন্যান্য সমালোচকদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ও অজিত চক্রবর্ত্তীর নাম স্মরণীয়। সাধারণতঃ একটু ভাবপ্রবণ হইলেও বাঙ্গালীর হৃদয়, বাঙ্গালীব দৃষ্টি ও বাঙ্গালীর মমতা দিযা দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬—১৯৩৯) মত আর কেহ বাংলা সাহিত্যকে দেখেন নাই। অপেক্ষাকৃত পববর্ত্তীকালে পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-দর্শন-প্রভাবিত শশাঙ্কমোহন সেনের (১৮৭৩—১৯২৮) নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। 'মধুসূদন' ও 'বঙ্গবাণী' তাঁহার দুইখানি অনতিক্রমনীয় সমালোচনা-গ্রন্থ। আধুনিক কালে যাহারা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের পরিপুষ্টি বিধান করিতেছেন, তন্মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নলিনী গুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১১

গদ্য-সাহিত্য (বিবিধ)

উপরে যে কয়েকপ্রকার গদ্য-সাহিত্য আলোচিত হইয়াছে তাহা ব্যতীত জীবনচরিত, আত্মচরিত প্রভৃতি আরও কয়েকটি এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করিব।

জীবন-চরিতের সাহায্যে আমরা মানুষের অন্তর পুরুষটীকে জানিতে পারি। চরিত-লেখকদিগের কতকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, লেখকের পক্ষে অনেক সময়েই মৃত ব্যক্তির জীবনী-সংক্রান্ত যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। স্বল্প বিষয়-বস্তুই তাঁহাকে অনেক সময় একমাত্র মূলধন বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, মৃত্যুর পর কোন্ ব্যক্তির জীবনের কতখানি প্রকাশ্য, কতখানি অপ্রকাশ্য, ইহাও বিবেচনার বিষয়। অবশ্য, ইহা প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত যে, মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তির দোষগুলি গোপন করিয়া তাঁহার গুণেরই সমাদর করা বিধেয়। কিন্তু অস্বাভাবিক আত্মগোপন দ্বারা আবার জীবনচরিতের অসম্পূর্ণতা বিধান করা হয়। আসল কথা এই, লেখক এমন ভাবে গ্রহণ ও বর্জ্জন করিবেন, যাহাতে পরিপূর্ণ লোক-চরিত্রটী অঙ্কনে তাঁহার মোটেই অসুবিধা না হয়। এইজন্য লেখকের মানবচরিত্র সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়। যাহার জীবনচরিত লিখিত হইবে, তাহার সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হওয়া লেখকের একান্ত কর্ত্তব্য; নতুবা তিনি সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটীর চিত্ত-কথা সর্ব্বজনবেদ্য করিয়া তাঁহারই আদর্শকে মূর্ত্ত করিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত, তাঁহাকে সর্ব্বত্রই মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি নিজে স্রষ্টা হইলেও, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবভাবনার স্থান নাই। তিনি যাহা দেখিতেছেন, প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাহা শুধু চিত্রকরের ন্যায় অঙ্কন করিবেন। জীবনচরিতটী কত গভীর করিয়া, কত অন্তহীন কালের

জীবন-চরিত

জন্য মানবসমাজকে অনুপ্রাণিত করে এবং উহা লোকটীকে কতখানি জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছে, ইহার উপর জীবনচরিতের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। ইহাতে অঙ্কিত মানবাত্মার জয়যাত্রার কাহিনী আমাদিগকে যদি আশায়, ভরসায় ও সহানুভূতিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে পারে এবং আমাদের মধ্যে তদনুরূপ ভাব-কল্পনার অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিতে পারে, তবেই উহার সার্থকতা। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় জীবন-চরিত খুব অধিক সংখ্যক নাই। যে কয়েকটী আছে, তন্মধ্যে Lewes-এর *Life of Goethe*, Boswell-এর *Life of Dr. Johnson*, এবং বাংলা সাহিত্যে অজিত চক্রবর্ত্তীর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', যোগীন বসুর 'মধুসূদনের জীবনী', মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ভূদেব-চরিত', নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রামমোহন', চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর চরিত', সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'বিবেকানন্দ-চরিত'-এর নাম করা যাইতে পারে।

জীবন-চরিত ব্যতীত আত্ম-চরিত নামক আর এক শ্রেণীর সাহিত্যের কথা না বলিলে এই অধ্যায়টী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

আত্ম-চরিত

ডাঃ জন্‌সন্ বলেন যে, প্রত্যেকের জীবনচরিত আত্মকৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এক হিসাবে কথাটী সত্য। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, আত্মচরিত লেখকগণ আত্মচরিতকে এমন দাম্ভিকতা ও অসামান্য লজ্জাহীন বর্ণনায় ক্লান্ত ও মিথ্যার প্রশ্রয়ে ভাবাক্রান্ত করেন যে, ঐ সব দেখিয়া আমরা লেখকের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখিতে পারি না। বিশেষতঃ, লেখক নিজের কথা বলিতে গিয়া যখন ভবিষ্যৎ কালের পাঠকের কথা স্মরণ করেন, তখন লজ্জা ও বিচারবুদ্ধি আসিয়া পড়ায় তাঁহার জীবনের অনেক গভীর কথাই তিনি পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারেন না। ফলে, তিনি অকপটে আত্ম চরিত রচনা করিতে পারেন না। এইজন্য আত্ম-চরিত অনেক সময়ই ব্যক্তি-জীবনের সঠিক বৃত্তান্ত নয়। কিন্তু যিনি জীবনের কথা, অভিজ্ঞতার কথা অকপটে বিবৃত করিতে পারেন, তাঁহার গ্রন্থে সত্য যেরূপ সুন্দর ও অভাবনীয় প্রাণরসে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তাহা

চিরদিনের সাহিত্য হিসাবে অনবদ্য। আত্ম-চরিত লেখকের পক্ষে অতি মাত্রায় নম্রতা বা অতিমাত্রায় আত্ম-সচেতনতা, উভয়ই ক্ষতিকর। লেখক কখনো কখনো সুসংবদ্ধ আত্ম-চরিত না লিখিয়া জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা-পরিক্রমা—*Diary* বা আত্ম-পঞ্জী, এবং *Memoir* বা স্মৃতি-কথা রচনা করেন। এই জাতীয় পুস্তকে লেখকের ব্যক্তিগত দিকটী অধিকতব পরিস্ফুট হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইংরেজী সাহিত্যে St. Augustine-এর *Confessions,* Gibbon-এব *Autobiography,* Davies-এর *Autobiography of a Super-Tramp,* এবং বাংলায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী ও নবীনচন্দ্র সেনের আত্মচরিত উল্লেখযোগ্য। Samuel Pepys-এব *Diary* ও *Amiel's Journal*-এর মত বই বাংলায় বেশি নাই। এই প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র দত্তের 'পুরাণো কথা' ও চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গদাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা'-র নাম করা যাইতে পারে। স্মৃতি-কথা জাতীয় বইয়ের মধ্যে ইংরাজীতে নেপোলিয়ন-এর স্মৃতি-কথা এবং বাংলায় রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' ও 'ছেলেবেলার' নাম করা যাইতে পারে।

চিঠি-সাহিত্য

চিঠি-সাহিত্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাও আবার দুইভাগে বিভক্ত, যথা— পত্রিকা (*Epistle*) ও চিঠি (*Letter*)। প্রথমোক্ত রচনা কোন শ্রোতৃবর্গকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত এবং উহাতে সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য ও সৌষম্য বিদ্যমান। ইহা যেন সর্ব্বসমক্ষে বক্তৃতা-প্রদানের মত। কিন্তু চিঠির মূল্য বক্তৃতায় নয়, আড়ম্বর-পূর্ণ ও আভরণমণ্ডিত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে নয়,—দুইটী মানবাত্মার পরস্পরের হৃদয়ের সংযোগে-সাধনে। প্রথমোক্ত শ্রেণীতে লেখকের অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের কথা পাই, তাঁহার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি—কান পাতিয়া তাঁহার মনের কথা শুনিতে পাই না। এই জাতীয় চিঠিসাহিত্যে ডাঃ জন্‌সন্ ও ষ্টিভেন্‌সনের চিঠি, এবং বাংলায় নবীনচন্দ্রের 'প্রবাসের পত্র', রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র', 'জাপান যাত্রীব ডায়েরী', 'রাশিয়ার

চিঠি' ও শরৎচন্দ্রের বা মধুসূদনের কতকগুলি চিঠি এবং স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলীর' নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম শ্রেণীতে লেখক কবি বা সাহিত্যিক, দ্বিতীয় শ্রেণীতে লেখক মানুষ। ইংরেজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর চিঠি-সাহিত্যে কুপার, ল্যাম্ব, কীটস্ প্রভৃতির চিঠি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় চিঠি-সাহিত্য বাংলায় নাই বলিলেই হয়।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-সংক্রান্ত সাহিত্যও গদ্য-সাহিত্যের একটী বিশেষ দিকের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। মানুষ যে কেবল নিজেকেই জানিতে চায় তাহাই নয়, বাহিরের জগতের আহ্বান প্রতিনিয়তই তাহাকে টানিতেছে। এই আহ্বানে প্রলুব্ধ হইয়া অনেক লোক দেশভ্রমণে বহির্গত হয়। নানাদেশ, নানাজাতি, তাহাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্নরূপে ধরা দেয়। বাহিরের এই বস্তুসত্তাকে লেখক মানস-রসে প্রত্যক্ষ করিয়া তথ্য-সম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই জাতীয় গ্রন্থে বস্তু-সত্তাব প্রাধান্য থাকিলেও উহার মধ্যে ব্যক্তিগত-দৃষ্টিভঙ্গিও থাকিতে পারে। ইংরেজী সাহিত্যে হক্সিলির *Jesting Pilate* পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যে-তাজমহল বিশ্বের অসংখ্য নরনারীকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা লেখকের নিকটে শুধু ঐশ্বর্য্যের ব্যর্থতার প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। সুতরাং লেখকের ব্যক্তিগত চিত্তও এখানে ধরা পড়ে।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

যিনি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতে চাহেন, তাঁহার দৃষ্টি অপক্ষপাত, মন সংস্কৃতিবান ও যে-কোন জিনিসকে সহৃদয়তা দ্বারা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। বাংলায় যে কয়েকটী ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আছে, তন্মধ্যে দুর্গাচরণ রায়ের 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' নামক বইখানা গল্প-মাধুর্য্যে, হাস্যরসে ও তথ্য-পরিবেশনে অপূর্ব্ব। এতদ্ব্যতীত, রবীন্দ্রনাথের 'জাপান-পারস্যে', 'যাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি'; জলধর সেনের 'হিমালয়'; প্রবোধকুমার সান্ন্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ও অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১২

রোমান্টিসিজম্ ও ক্ল্যাসিসিজম্

সমালোচনাশাস্ত্রে রোমান্টিসিজম্ ও ক্ল্যাসিসিজম্, এই দুইটী শব্দ প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এইজন্যই ইহাদের মূল কথাটী সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

ইংরেজী সাহিত্যে Romanticism

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই যুগের যুগন্ধর কবিগণ ফরাসী ও ল্যাটিন কবিদের অনুপ্রেরণায় ব্যঙ্গ-কবিতাকেই শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া মনে করিতেন। কবিতায় তাঁহারা কোন ঐশী-প্রেরণা বা দিব্যানুভূতিকে স্বীকার করিতেন না; বরং মস্তিষ্ক-প্রসূত বুদ্ধিনিষ্ঠ কল্পনাকেই তাঁহারা যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কবিতায় ভাবানুভূতির আন্তরিকতা মোটেই ছিল না; তাঁহারা প্রাণ দিয়া অনুভব করেন নাই, মস্তিষ্ক দিয়া, বিচার দিয়া, বুদ্ধি দিয়া উপলব্ধি করিতেন। এইজন্য তাঁহাদের কবিতা নীরস শব্দাড়ম্বরে পর্য্যবসিত হইত। এই জাতীয় কবিতার তথাকথিত সংযমের বিরুদ্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে গ্রে, কলিন্স্, ব্লেক্, বার্ণস্ প্রভৃতি ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট বিদ্রোহের সূচনা করেন। ইহাদের পরে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ্ ও কোল্রিজ ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে *Lyrical Ballads* নামক কাব্য প্রকাশ করিয়া সাহিত্যে যে যুগান্তর আনয়ন করেন, তাহাকেই ইংরাজী সাহিত্যে *Romantic Movement*-এর সূত্রপাত বলা হয়। ইহারা ঘোষণা করিলেন যে, সত্যকার কবি-কল্পনা মস্তিষ্ক-প্রসূত নহে, হৃদয়-প্রসূত। হৃদয়-প্রসূত এই কল্পনার সাহায্যে তাঁহাদের কাব্যে যথাক্রমে

দীনতম বস্তু কল্পনা-কান্ত রূপ-পরিগ্রহ করিল, এবং অতিলৌকিক বিষয়বস্তুও একান্ত স্বাভাবিক রূপে প্রমূর্ত্ত হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বুদ্ধিনিষ্ঠ কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া যে-যুগ অবতীর্ণ হইল, তাহাই ইংরাজী সাহিত্যে রোমাণ্টিক যুগ। পূর্ব্বযুগের কবিতা বিচার ও বুদ্ধিপ্রধান, এই যুগের কবিতা কল্পনা-প্রধান। তাই, এই যুগের কবিগণ দেখিলেন, আকাশের তারায় ও স্তব্ধ নীলিমায় কোন্ ভাষাহারা সঙ্গীত; শিশু-প্রকৃতিতে কী অপূর্ব্ব বিস্ময়; দীনতম কৃষাণ-জীবনে কী অপরিসীম শান্ত মহিমা; অতিলৌকিক জগতের অবাস্তবতা কতখানি স্বাভাবিক ও সত্য; অতীতের অন্ধকারম্লান সৌন্দর্য্যে কী সীমাহীন কান্তি; পতিত ও ব্যথিত জনের হৃদয়-কন্দরে কী স্বর্গীয় মাধুর্য্য; প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ শব্দে কী অপূর্ব্ব আমন্ত্রণ!

এখন কথা হইল, কী করিয়া এই জিনিষটী সম্ভব হইল? এই নূতন ভাব-দৃষ্টির নবজন্মের পশ্চাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় তিনটী। ইহার এক দিকে রুশোর বিদ্রোহমূলক জীবন-দর্শন, অপর দিকে জার্ম্মাণীর ক্যাণ্ট-হেগেল প্রবর্ত্তিত তুরীয়বাদ (*Transcendentalism*)। রুশো *Emile*, *The Social Contract*, *New Heloise* প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া মানুষ হিসাবে মানুষের জীবনের মর্য্যাদাবোধ, প্রকৃতির সহিত মানবমনের নিগূঢ় সম্বন্ধ ও প্রেমের অভাবনীয় শক্তি সম্বন্ধে তৎকালীন জনমনকে সচেতন করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, জার্ম্মাণ-দর্শন মানুষের ভাব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ক্যাণ্টই প্রথম বস্তু জগৎকে কবির আত্মরসে রসায়িত অখণ্ড সৌন্দর্য্য রূপে উপলব্ধি করিলেন, এবং রুশো অপেক্ষা উগ্রতর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ক্যাণ্ট-এর পর জার্ম্মান-দর্শনের আর একটী তত্ত্ব—চিৎ (*Mind*) ও জড়ের (*Matter*) অদ্বৈতবাদ— এই রোমাণ্টিক ভাব-কল্পনাকে পল্লবিত করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, ফরাসী-বিপ্লবের অনুপ্রেরণা। ফরাসী-বিপ্লব এক হিসাবে

Romantic যুগ প্রবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ

ব্যর্থ হইলেও বিপ্লববাদীদের সেই 'সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতার' উদাত্ত বাণী মানুষের ভাবজগতকে নবজন্মদান করিয়া গিয়াছে। এই তিনটী কারণেই রোমাণ্টিক যুগ সম্ভবপর হইয়াছিল—মানুষের চক্ষে বিশ্ব অভিনব রূপে দেখা দিয়াছিল।

সমালোচকগণ এক এক ভাবে এই মানস-দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা কয়েকটী উল্লেখযোগ্য মত আলোচনা করিব।

Romanticism অর্থ কি ?

Watts-Dunton বলেন, রোমাণ্টিক ভাব-কল্পনার বিশেষত্ব, বিস্ময়-রসের পুনরুজ্জীবন (*Renascence of wonder*); Pater ইহাকে সুন্দরের সহিত অদ্ভুতের পরিণয় (*Addition of strangeness to beauty*), Victor Hugo ইহাকে সাহিত্যে উদার-প্রাণতা, Brunetiere ইহাকে সাহিত্যে আত্মমুক্তি, আবার কেহ বা ইহাকে প্রকৃতির রূপমাধুর্য্যানুভূতি (*Return to Nature*) বা অতীতের প্রতি শ্রদ্ধারূপে আখ্যাত করিয়াছেন। ইহাদের কোন সংজ্ঞাই সর্ব্বদেশদর্শী নয়। এমতাবস্থায় আমরা Herford-এর '*An extraordinary development of imaginative sensibility,*'-কেই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী সংজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তিনি বলেন যে, কল্পনা-প্রবণতার অসাধারণ বিকাশই রোমাণ্টিক কবিতার লক্ষণ। সত্য কথা বলিতে কি, কল্পনা-প্রবণতাই এই যুগের কবিতাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সংযত-কল্পনার যুগ হইতে বিভিন্ন করিয়াছে। যাঁহার কল্পনা নাই, তিনি কখনো বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে সাধারণ জিনিষের মহিমার দিকটী উপলব্ধি করিতে পারেন না ; কল্পনা না থাকিলে কখনো সুন্দর ও অদ্ভুতের মিলনটী কাহারও দৃষ্টি-সম্মুখে প্রত্যক্ষ হয় না। স্বল্প-সন্তুষ্ট, কল্পনা-বিহীন মানুষ কখনো আত্মমুক্তির প্রয়োজন অনুভব করে না বা বিশ্বের যাবতীয় বস্তু-সত্তাকে উদার অনুভূতির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না। আবার, এই কল্পনাবলেই কবি বর্ত্তমানের বন্ধন-বিমুক্ত হইয়া, কখনো অতীতের স্মৃতি-গুঞ্জরণে, কখনো বা অনাগতের মোহে মুগ্ধ হইতে পারেন অথবা প্রকৃতির রূপ রস আস্বাদন করিতে পারেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, এই একটী মাত্র কথাই *Romanticism*-এর অন্তর্নিহিত সত্যকে সমগ্রভাবে প্রকাশ করে। ইংরেজী সাহিত্যেও দেখিতে পাই যে, এই কল্পনা বলেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাধারণ বস্তুকে অসাধারণ গৌরব-মহিমা দান করিয়াছেন এবং প্রকৃতি-পূজায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছেন; কোল্‌রিজ অতি-প্রাকৃত পরিবেশকে স্বাভাবিকতা দান করিয়াছেন; শেলী অনাগত জগতের কল্পনায় বিমুগ্ধ; কীটস্‌ ও স্কট অতীতের মধু আহরণ করিতেছেন; এবং বায়রণ আত্মমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ম.ন রাখা দরকার যে, ইঁহাদের প্রত্যেকের কল্পনাই একান্তভাবে আত্মপরায়ণ।

বাংলা সাহিত্যে Romanticism

ভারতচন্দ্র-প্রমুখ কবিদের যুগে সাহিত্যে যুক্তি-প্রধান, বস্তুনিষ্ঠ ও বিদ্রূপাত্মক রচনারই প্রাধান্য ছিল। বিশেষতঃ, ছন্দের দিক দিয়াও এই যুগে পয়ার ছন্দই কায়েমী হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্ত্তী কবিদের কালে ইহার বিরুদ্ধে ভাববাদ, ব্যক্তি-নিষ্ঠা ও কল্পনা-প্রবণতার যে নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইল, তাহাই বাংলা সাহিত্যেও রোমান্টিক যুগ বলিয়া অভিহিত। মধুসূদন দত্তের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যময় বিদ্রোহী ভাব-কল্পনায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের অতীত-বিহারী উপন্যাস-সৃষ্টিতে, নবীনচন্দ্রের অতীত-উদ্ধারে, হেমচন্দ্রের আত্ম-বিলাপে, বিহারীলালের আত্ম-বিভোরতায়, রবীন্দ্রনাথের অত্যুচ্চ ভাববাদে, এবং শরৎচন্দ্রের পতিত ও নির্য্যাতিত মানবতার প্রতি শ্রদ্ধায়—সেই একই রোমান্টিক সুর।

অনেকে মনে করেন, *Romantic* ও *Classical*—এই দুইটী মানস-দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মী। কিন্তু ইহা একান্ত ভ্রান্ত ধারণা।

Romantic ও Classical দৃষ্টিভঙ্গি

কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তি, এই দুইটী মানব মনের চিরন্তন লক্ষণ—একটী ব্যতীত অপরটী অর্থহীন। রোমান্টিক কল্পনা মানবচিত্তকে আন্দোলিত, উদ্বেলিত ও সচল করে; ক্ল্যাসিক কল্পনা সংযত ও সংহত করে। কল্পনা-প্রবণতা হেতু

রোমাণ্টিসিজম্ ও ক্ল্যাসিসিজম্

একটী অঘটনঘটনপটীয়সী, অশান্ত, বিদ্রোহী; অপরটী শান্ত সমাহিত-সাধনার পক্ষপাতী। প্রথমটীর কথা বলিলেই উত্তেজনা, উন্মাদনা, প্রাণ-প্রাচুর্য্য প্রভৃতির সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই; দ্বিতীয়টীর কথা বলিলে আমরা প্রশান্তি, যথাযোগ্যতা, সংযম, আত্মস্থতা প্রভৃতি সম্বন্ধে সচেতন হই। বলা বাহুল্য, কোন কাব্যে এই দুই লক্ষণই বিদ্যমান থাকিতে পারে। যেখানে বা যে-সাহিত্যে শুধু একরূপ ভাবধারা প্রবল, সে-সাহিত্য রোমাণ্টিক হইলে, অতিরিক্ত ভাবাতিরেকের স্তরে উত্তীর্ণ হয়; এবং ক্ল্যাসিকেল হইলে রসহীন, প্রাণহীন পদার্থে পরিণত হয়। কোন্ সাহিত্য রোমাণ্টিক, কোন্ সাহিত্য ক্ল্যাসিকেল ইহা বিচার করিতে কবির মানস-দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে যেমন কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বয় হইয়া থাকে, তেমনি তাদৃশ কাব্যেও এই দ্বিবিধ মানসভঙ্গিরই সমন্বয় সাধন হইয়া থাকে। এই জন্যই এই দুইটীকে মানব-হৃদ-যন্ত্রের উত্থান ও পতনের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। হৃদযন্ত্রের উত্থান পতনকে সাহায্য করে এবং পতনের পর উত্থানেরও জৈবিক প্রয়োজন আছে। সাহিত্যেও তেমন, কল্পনা-প্রবণতা ও সংযম— এই দুইটীই প্রয়োজনীয়। ইহা হইতে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, *Romanticism* ও *Classicism*-এর মধ্যে সত্যকার কোন বিরোধ নাই, বরং একটী অপরটীর পরিপূরক।

১৩

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্র

(Realism and Idealism)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকজন ইংরেজ সাহিত্যিক তাঁহাদের সাহিত্যে জীবনের কুশ্রী ও গোপন দিকটীর যথাযথ অভিব্যক্তি দান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর সাহিত্যকে আমরা বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য (*Realistic Literature*) নামে আখ্যাত করিতে পারি। কিন্তু যে-শ্রেণীর সাহিত্যে লেখক জীবনের তথ্য-ঘটিত যথাযথ বর্ণনা দ্বারা একরূপ জড়বাদের পূজা না করিয়া বরং জগৎ ও জীবনের তথ্য-সত্যকে উচ্চতর কল্পনার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দেখেন এবং উহার অপার রহস্যের চিন্ময় মূর্ত্তি পাঠকের গোচর করেন, তাহাকে ভাবতান্ত্রিক সাহিত্য (*Idealistic Literature*) কহে।

জীবনের গোপনীয় বা কুশ্রী দিকটী সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারে না, এমন কথা আমরা বলি না। কিন্তু সাহিত্যিক যদি জীবনের পঙ্ক হইতে পঙ্কজের সৃষ্টি করিতে না পারেন, তবে তাঁহার সৃষ্টির কোন সার্থকতা নাই। কারণ, বাস্তববাদীগণ যে সত্য-কল্পনা-প্রয়াসী, তাহা সাহিত্যের সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। এই ধরণের কল্পনা মূলতঃ তথ্যাশ্রয়ী। সুতরাং কেহ যদি ইহাই চাহেন, তবে তাহাকে সাহিত্য ছাড়িয়া বিজ্ঞানের পূজারী হইতে হইবে। অর্থনীতি ও রাজনীতি শাস্ত্রে, গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত রিপোর্টে, স্কুল কলেজে ছাত্রদের নামডাকের বহিতে বা বাজার-হিসাবে তথ্য-ঘটিত সত্যের অভাব নাই। কিন্তু, এমন বোধ হয় কেহ নাই, যিনি উহাদিগকে সাহিত্যিক মর্য্যাদা দান করিতে চাহেন।

দৃষ্টান্ত স্থলে আরও বলা যায়, মানুষের সম্বন্ধে সত্য-সন্ধানী হইয়া যিনি শারীব বিদ্যার সাহায্যে কোন সত্য আবিষ্কাব করেন, তাহা সাহিত্যের সীমানাব বহির্ভূত; কিন্তু মানুষকে যেখানে 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলিয়া আহ্বান করা হইয়াছে, সেখানে উহা সাহিত্য। কারণ, রক্ত মানুষেব মানুষ সেখানে মানুষের দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করিয়াও, তাহাকে মাটির পৃথিবীতে রাখিয়াও, অমৃতের স্পর্শে গরীয়ান কবিযা তুলিয়াছে। সুতরাং বলিতে হয় যে, নিছক বাস্তবতা সাহিত্যের উপজীব্য হইতে পারে না এবং নিছক বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য বিশুদ্ধ সাহিত্য-রূপ-কল্পনার বিরোধী। সাহিত্যে যাহাকে আমরা বাস্তব বলি, তাহা নিছক জড় বাস্তব নয়, চিন্ময় বাস্তব। কারণ, সাহিত্য—তথা ললিতকলা, বাস্তবকে রূপান্তরিত করিযা নবজন্ম পরিগ্রহ করাইয়া সুন্দর রস-মূর্ত্তিতে প্রকাশ করে। আসল কথা এই যে, বাস্তবতা ভাববাদের (*Idealism*) স্পর্শে কাব্যগত সত্যে উন্নীত হইয়াও ভাবাতিরেকের সীমা লঙ্ঘন করিবে না, এবং ভাববাদও লেখকের আত্মকেন্দ্রিক উচ্ছৃঙ্খলতামুক্ত হইয়া পাঠককে কাব্য-সত্যে মুগ্ধ করিবে। সর্ব্বশেষ কথা এই যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে শুধু এক প্রকার বাস্তবতাই দৃষ্ট হয়—উহাকে আমরা ভাববাদের বাস্তবতা (*Realism of Idealism*) বলিতে পারি। এইজন্যই ষ্টিভেনসন্ বলেন—

'And the true realism were that of the poets, to climb up after him like a squirrel, and catch some glimpse of the heaven for which he lives. And the true realism, always and everywhere, is that of the poets to find out where joy resides and give it a voice far beyond singing.'

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্র সম্বন্ধে শ্রীযুত অতুল চন্দ্র গুপ্ত বলেন, 'কোন্ কবি কোন্ কাব্য-কৌশল অবলম্বন করবেন, তা নির্ভর করে তাঁর প্রতিভার বিশেষত্বের উপর। এই দুই কৌশলের সৃষ্ট রসের মধ্যে আস্বাদের প্রভেদ আছে, কিন্তু রসত্বের প্রভেদ নাই। সুতরাং কেউ

কাউকে কাব্যের জগৎ থেকে নির্ব্বাসন দেবার অধিকারী নয়'। ¶ এইস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, 'প্রতিভার বিশেষত্ব' থাকিলে কোন কবি বা সাহিত্যিককে 'নির্ব্বাসন দেবার' কথা অবশ্য আসে না। কিন্তু নিছক বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের অন্য কোন প্রয়োজন থাকিলেও উহা সাহিত্য নামক রূপ-কর্ম্ম পদবাচ্য কিনা সন্দেহ। জনৈক বিখ্যাত সমালোচকের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, 'They are useful, if only we do not mistake them for works of art'। §

১৪

সাহিত্যে রস-সর্ব্বস্বতা নীতি

(Art for Art's sake)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সাহিত্য ও যাবতীয় ললিতকলার জগতে ইংলণ্ডে এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইহার পূর্ব্বে সাহিত্যে এই আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণের মধ্যে ফরাসী দেশের Zola, Baudelaire প্রমুখ লেখকগণ বিশেষ বিখ্যাত। য়ুরোপীয় সাহিত্যে Aristotle, Plato, Lessing, Cousin, Ruskin, Matthew Arnold প্রভৃতি যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার মূলমন্ত্র এই যে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য, জীবনে সত্য, সুন্দর ও শিবের প্রতিষ্ঠা। সাহিত্যিক মানবজীবনের কাহিনী হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহাকে কল্পনার সাহায্যে পরিবর্তিত ও অভিনব রূপে প্রকাশ করিবেন।

¶ অতুলচন্দ্র গুপ্ত : কাব্য-জিজ্ঞাসা। § Worsfold ; *Principles of Criticism.*

কিন্তু এই মতবাদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে Whistler, Swinburne, Oscar Wilde প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্যিক বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে যে-সাহিত্য সৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত চলিতে থাকে। এই নূতন-পন্থীগণ বলিতে চাহেন যে, সাহিত্যে ও শিল্পে জীবন-ঘটিত কোন আদর্শ বা নীতির শাসন না থাকিলেও চলিতে পারে, কারণ নিছক রস-সৃষ্টি (*Art for Art's sake*) ব্যতীত সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। এইজন্যই ইহাদের সৃষ্টিতে '*sense of fact*' বা 'বাস্তবতা-বোধ'-এর প্রাধান্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়। মানব-জীবনের নগ্নতা, মানুষের দীনতা, হীনতা, স্বার্থপরতা, বুভুক্ষা, কামনা, আসঙ্গ-লিপ্সা প্রভৃতি সকলকেই যথাযথরূপে মূর্ত্ত করিবার অধিকার সাহিত্যিকের আছে, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। এইজন্যই দেখা যায় যে, এই যুগের সাহিত্যিকগণ কামনার বিষপুষ্প সৃষ্টি করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছেন, এবং দেহের দেহলীতে ভোগারতি সাজাইয়া আত্মঘাতী প্লাবন ডাকিয়া আনিয়াছেন। এইভাবে সাহিত্যে তাঁহারা নূতনতর বস্তুতন্ত্রের আমদানী করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের উৎকেন্দ্রিক সৃষ্টি তাঁহাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছিল, তাহা একবারও তাহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। বাংলা দেশেও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে কতিপয় সাহিত্যবিলাসী এই সৃষ্টিমোহে অধীর হইয়া যে-সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছিলেন, তাহা এই দেশেও 'কামায়ন সাহিত্য' আখ্যা লাভ করিয়াছিল।

এখন কথা এই যে, *Art for Art's sake* বা সাহিত্যে রসসর্ব্বস্বতার নীতি চলিতে পারে কিনা। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, *Art* বা রূপ-কর্ম্ম মানুষেরই অন্তরের তাগিদে সৃষ্টি। বাস্তব জীবনে যাহা পাওয়া যায় না, সাহিত্যে ও শিল্পে মানুষের সেই স্বপ্ন-কামনাই জীবনের পরিপূরক রূপে ফুটিয়া উঠে। কারণ, জীবনের বৃত্তাংশ সাহিত্যে ও সুকুমারকলায় পূর্ণ-বৃত্ত হইয়া উঠে। মানুষ পূর্ণভাবে বাঁচিতে চায়, জীবনকে সুন্দর করিয়া পাইতে চায়; এইজন্যই তাহার শিল্পানুরাগ ও সাহিত্য-সৃষ্টি। সুতরাং,

সাহিত্যকে জীবনের আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে উহার মূলচ্ছেদ করা হয়। অবশ্য, মূলচ্ছেদ হইলে শিল্প-তরু বাঁচিতে পারে কিনা, ইহা স্বল্প-বুদ্ধিরও বুঝিতে বাকি থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থনীতি শাস্ত্রে যেমন কথা আছে, টাকার নিজের কোন মূল্য নাই, টাকা কতখানি অন্য জিনিস বিনিময়ে পাইতে পারে তাহাই উহার মূল্য নিয়ামক, তেমন *Art*-এর মূল্যও ইহার স্বপ্রতিষ্ঠায় নহে, জীবনের সহিত ইহার সম্পর্ক রক্ষার সহায়তায়। কারণ, আর্ট জীবনের কাহিনী দ্বারাই সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট। ইহাতে শুধু স্রষ্টার আত্মভাবস্পর্দ্ধী ব্যক্তি-কামনার প্রকাশ পাইলে চলিবে না। তৃতীয়তঃ, জীবন সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য, এইদিক হইতে চিন্তা করিলেও সাহিত্য নীতিহীন হইতে পারে না। অবশ্য, উহা নীতিশাস্ত্রের নীতি হইবার অপেক্ষাও রাখে না, কারণ, জীবনের গভীরতর নীতি, সৃষ্টির গূঢ় রহস্য-নীতি উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবেই। ইহাও যদি না থাকে, তবে সাহিত্যে—যাহা কোন বৃন্ত-বিধৃত জীবনের রূপ-প্রকাশ, তাহার রূপের রূপত্বই থাকে না; ফলে, উহা সাহিত্যও হইয়া উঠিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, এই বাস্তব-পন্থীদের অনেকে বলেন যে, যেহেতু আর্ট জীবনের অনুগামী, সুতরাং জীবনের সকল 'বিশৃঙ্খলা, আকস্মিকতা ও অর্থহীন বস্তুস্তূপকে' ইহার স্বীকার করিতেই হইবে, কোন সীমা-নির্দ্দেশ ইহার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। ইহাতেই এই নূতন পন্থীদের সাহিত্যে এক জাতীয় অকুণ্ঠ বাস্তবতার উদ্ভব হয়।

এই স্থলে বক্তব্য এই যে, জীবনের যাবতীয় জিনিস বা ঘটনাকে সাহিত্যিক কোন দিনই গ্রহণ করেন না। জীবনের যে-কথা সুবিহিত সুসমঞ্জস সৌন্দর্য্য-দীপ্তিতে ভাস্বর হইতে পারে, তাহাই সাহিত্যের উপজীব্য। সাহিত্য যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সর্ব্বব্যাপী উদার মনোভাবের দ্বারা গ্রহণ করিবে, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত কথা। ইহার বিষয়বস্তু বারাঙ্গনার দেহ-বিপণিই হউক, পতিতার কামগন্ধী আত্মচরিতই হউক বা যৌনতত্ত্বই হউক, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু সাহিত্যিক

নিজের কল্পনার সাহায্যে তাঁহার বিষয়বস্তুকে পরিবর্ত্তিত করিয়া জীবন ও জগতরহস্যের মণ্ডলান্বিত সৌন্দর্য্য-সুষমা সৃষ্টি করিবেন। ব্রাউনিং তাঁহার সুর-শিল্পী *Abt Vogler* সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা মূলতঃ যাবতীয় শিল্পীরই সাধনার বস্তু—

"Out of three sounds he frame not a fourth sound, but a star."

আমাদের শরৎচন্দ্রও বলেন—

"Art for Art's sake কথাটা যদি সত্য হয়, তা হ'লে কিছুতেই তা immoral এবং অকল্যাণকর হ'তে পাবে না এবং অকল্যাণকর এবং immoral হ'লে Art for Art's sake কথাটাও কিছুতেই সত্য নয, শত সহস্র লোক তুমুল শব্দ করে বল্‌লেও সত্য নয। মানব জাতির মধ্যে যে বড় প্রাণ আছে সে একে কোনমতেই গ্রহণ করে না।" ২

এই সম্বন্ধে *G. K. Chesterton*-এর মত নির্ভীক কথা এই যুগে আর কেহ বলিয়াছেন কিনা জানিনা—

'There must always be a moral soil for any great aesthetic growth. The principle of *Art for Art's sake* is a very good principle if it means that there is a vital distinction between the earth and the tree that has its roots in the earth, but it is a very bad principle if it means that the tree could grow just as well with its roots in the air.'

সুতরাং দেখা যায়, আর্টে কোন ক্রমেই রসসর্ব্বস্বতা-নীতিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ডি. এইচ্. লরেন্স যখন বলিয়াছিলেন যে, Art for *my* sake-ই একমাত্র নীতি, তখন তিনি নিজের অজানিতেও অনেকখানি সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। সাহিত্যিক নিজের জন্য, আত্মমুক্তির জন্য সাহিত্য-সৃষ্টি করেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই 'আমি' একান্ত ভাবে আত্ম-পূজা নহে। স্ব এবং বিশ্ব বা পাঠকজন, এই দুইয়ের সহযোগে সাহিত্যিকের ব্যক্তি-সত্তা গঠিত হয়। কাজেই, আর্টে রস-সর্ব্বস্বতা-নীতির পরিবর্ত্তে, সর্ব্বজনীন-চেতনামূলক-রস-সৃষ্টিবোধকেই প্রাধান্য দেওয়া আমরা শ্রেয়ঃ মনে করি। এবং ইহাই সাহিত্যের স্ব-ধর্ম্ম।

২ শরৎচন্দ্র : স্বদেশ ও সাহিত্য

১৮

বাণীভঙ্গি

(Style)

বিশ্বের এক একটী লোক এক একটী বিভিন্ন সৃষ্টি। জাতি হিসাবে সকল মানুষই এক হইলেও ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেকেরই কোন না কোন বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য গুণেই একজন অপর আর একজন হইতে বিভিন্ন। সুতরাং দেখা যায়, ব্যক্তি-বিশেষ যেখানে সকলের সঙ্গে এক, সেখানে সে ব্যক্তিত্বহীন; যেখানে সে সকলের অপেক্ষা অন্যতর, সেখানেই তাহার স্বকীয়তা। ব্যবহারিক জীবনের এই একান্ত স্বকীয়তা যেমন ব্যক্তি-পরিচায়ক, সাহিত্য-জগতেও তেমনই লেখকের বিশিষ্ট রচনা-ভঙ্গি তাঁহার মানস-ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। অর্থাৎ দুইটী জগতেই মানুষের একটী বিশেষ ষ্টাইল্ আছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, যিনি শুধু অন্যের গ্রামোফোন, তাঁহার কোন ষ্টাইল্ নাই—তিনি নকল।

সূচনা

সাহিত্য-জগতে রচনার এই বিশিষ্টতাকে আমরা ষ্টাইল্ বা বাণীভঙ্গি বলি। যাহার ষ্টাইল্ নাই, তিনি শুদ্ধ লিখিতে পারেন, সহজ লিখিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব দ্বারা আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারেন না। একান্ত সংস্কৃত-বহুল রচনার মধ্যে যখন দেখি, লেখকের ভাষায় অতি সুগভীর একটী স্নিগ্ধ সকরুণ প্রসাদগুণ, তখনই মনে হয়, ইহা নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগরের লেখা; যখন দেখি, কঠোরতার সহিত কোমলতার রাখী-বন্ধনে বুদ্ধি ও অনুভূতি এক হইয়া গিয়াছে, তখন মনে হয় ইনি বঙ্কিমচন্দ্র; যখন দেখি, ভাষা অসহ আবেগ-কম্পনে মৃদুতাসম্পন্ন, তখনই মনে হয় ইনি শরৎচন্দ্র; আবার যখন দেখি, বুদ্ধির অপূর্ব্ব সূক্ষ্মতা যেন চৈতন্যের তুরীয় জগতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখনই মনে হয়, ইনি রবীন্দ্রনাথ।

সাহিত্যে ষ্টাইল্

বাণীভঙ্গি

সাহিত্যের ষ্টাইল্ বলিতে আমরা উহার বিষয়বস্তু, লেখকের ব্যক্তিত্ব, ও প্রকাশ-ভঙ্গি—এই তিনটীর কথা ভাবি। বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া কবি-কল্পনা বিস্তার লাভ করিতে থাকে; কবি তাহাকে সুবিহিত চিন্তার দ্বারা যথা-প্রয়োজনীয় রূপে নমনীয় ও কমনীয় করিয়া তোলেন। কবি-কল্পনা কোন বিশেষ কেন্দ্রে লগ্ন থাকিয়াই মূল বিষয়ের অনুসঙ্গী নানা ভাব-কল্পনার সংযোজনায় একটী অখণ্ড সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে। এইজন্য আমরা বিষয়-বস্তুকে ষ্টাইলের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতে পারি। Pater বলেন :—

'The chief stimulus of good style is to possess a full rich complex matter to deal with'.

এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে পারি যে, বিষয়বস্তু বা ভাবকল্পনা (*Thought*) ষ্টাইলের প্রকৃতি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করিলেও ইহাকে ষ্টাইল্ বলা যাইতে পারে না। অনেকে আবার বিষয়বস্তুর প্রকাশ-ভঙ্গিকে ষ্টাইলের সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিক বামন বলেন, 'বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ' অর্থাৎ কাব্যের বিশিষ্ট অবয়ব-সংস্থানই ষ্টাইল্ † কিন্তু অবয়ব-সংস্থান বলিতে আমরা শুধু প্রকাশ-ভঙ্গিই বুঝি না। পাঠকের মনে বিষয়ানুরূপ ভাবসঞ্চারই প্রকাশ-ভঙ্গির প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকাশ-ভঙ্গির সহিত আবার প্রকাশক বা লেখকের ব্যক্তিত্ব অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিজড়িত। লেখকের মন বিষয়-বস্তুকে আত্ম-গোচর করিয়া তাহাকে অর্থসমন্বিত শব্দ-রূপ দান করে। সুতরাং লেখকের যথানুরূপ বিষয়-বিন্যাসে, শব্দচয়নশিল্পে ও চিত্রনিপুণতায় অবহিত হইতে হইবে। ভাষার মিতাক্ষর গাঢ়তা বা পরিমিতি রক্ষা করিবার জন্য লেখক গ্রহণ ও বর্জ্জনের সাহায্যে উপযুক্ত শব্দকেই শব্দের ভিড় হইতে নির্ব্বাচন করেন। তিনি নিজেও জানেন না, কোন্ শব্দটী তাঁহার বক্তব্যের বাহনরূপে সার্থক হইবে। কিন্তু সহসা তাঁহার নিজের অজানিতে যথা-প্রয়োজনীয় শব্দটী তাঁহার কলমের মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়; তিনি যেন সহসা

† *Cf. 'Style is a form of words'—A. Bennett.*

নিজের প্রজ্ঞা বলে সেই শব্দটীকে আবিষ্কার করেন। এই শব্দ-চয়ন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রও বলেন—

'কতকগুলা শব্দ-প্রয়োগের দ্বারা যিনি বাগাড়ম্বর করিতে পারেন, তাহাকে শব্দ-চতুর বলি না, অথবা যিনি শ্রুতি-মধুর শব্দ-প্রয়োগে দক্ষ, তাহাকেও বলি না। কাব্যোপযোগী শব্দের মাহাত্ম্য এই যে, একটী বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করিলে তদভিপ্রেত পদার্থ ভিন্ন অন্যান্য আনন্দদায়ক পদার্থ স্মরণ পথে আইসে।

এই বিশেষ শব্দটীব মধ্যে একদিকে যেমন ভাব-কল্পনার প্রকাশোপযোগী সংক্ষিপ্ততা বা রসঘনতা আছে, তেমনি আবার লেখকের আন্তরিকতার সৌরভ-স্পর্শ আছে। এইজন্যই শব্দ লেখকের মননশীলতা ও আন্তরিকতা—উভয় রসেই রসায়িত হইযা আত্ম-প্রকাশ করে। লেখকের বাণীভঙ্গির অন্তরালে তখন তাঁহার ব্যক্তি-সত্তা স্পন্দিত হব বলিয়া আমরা বলিয়া থাকি, *Style is the man.* কারণ, সেই ষ্টাইল্ লোকের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, 'নিছক ব্যক্তি-দৃষ্টি-ভঙ্গিই' শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অনুকূল নহে। কারণ, ব্যক্তি-চিন্তা বা ব্যক্তি-কল্পনা অধিকাংশ সময়ই আত্মতৃপ্তির ভাবাতিরেকে অভিভূত হইয়া একান্ত ভাবে আত্মবিলাসী হইতে পারে এবং তাহা হইলে লেখক অপরের হৃদয়ে ভাব-সঞ্চার করিতে পারেন না। সুতরাং, লেখকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র বিশিষ্ট বাণী-ভঙ্গি না-ও হইতে পারে। সত্যকার বাণী-ভঙ্গিতে একান্ত ব্যক্তি-কথা একান্ত ভাবেই নৈর্ব্যক্তিক হইয়া উঠে। এইজন্যই ষ্টাইলের পরিপূর্ণ প্রকাশে বিষয়বস্তু, লেখকের ব্যক্তিত্ব ও কলাকুশলতা—ইহাদের ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটে। বিষয়বস্তু ভাব-কল্পনাকে রূপ দেয়; ব্যক্তিত্ব লেখকের মানস-সত্তাকে প্রকাশিত করে এবং কলাকুশলতা ভাব-কল্পনাকে বাচ্যাতীত রূপে সমর্পণ করে। লক্ষ্য করিবার এই যে, এই তিনটীর মধ্যে প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য 'প্রকাশ'। বিষয়বস্তু যেমন স্বপ্রকাশ হয়, লেখক তেমনই তাঁহার ব্যক্তি-চিত্তকে প্রকাশিত করেন এবং সৃষ্টির সমগ্র রূপকান্তিও কলাকুশলতায় মূর্ত্ত হইযা

---

* বঙ্গদর্শন, ১২৮০

উঠে। বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গত বৃক্ষ যেমন পরিশেষে পুষ্প-সুষমায় বিকশিত হইয়া সুরভি বিস্তার করে, তেমনই লেখকও তাহার বাণী-ভঙ্গি দ্বারা ভাব-কল্পনার বীজকে তনু-শ্রী দান করিয়া একদিকে যেমন উহাকে ব্যক্তিগত ভাব-কল্পনার বাহন রূপে উপস্থাপিত করেন, তেমনই আবার উহার মধ্যে নির্ব্বিশেষ ভাব-ব্যঞ্জনার ইংগিত প্রদান করেন। এইজন্যই প্রকাশ-ভঙ্গিই ষ্টাইলের আদি ও শেষ কথা বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে *

১৬

গদ্য-কবিতা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা কয়েকজন কবি গদ্য-ছন্দকেই ভাববাহনের একমাত্র উপযোগী ছন্দ বলিয়া মানিয়া লইযাছিলেন। তাঁহাদের বাণী *Walt Whitman*-এর মত অগ্নি-গর্ভ ও প্রচণ্ড বিক্ষোভময় না হইলেও জীবনের আদর্শের সহিত তাঁহাদের যে সামঞ্জস্য হইতেছিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের ব্যক্তিগত আদর্শ সামাজিক বা অন্যবিধ আদর্শের সহিত ঐক্য খুঁজিয়া পায় নাই। এতদ্ব্যতীত, নূতনত্বের প্রতি আগ্রহও নূতন-ছন্দ প্রবর্ত্তনের একটী কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই কারণ গুলি বাংলার সাহিত্য-জীবন-বিচারে অধিকাংশ স্থলেই খাঁটিবে, সন্দেহ নাই। বাংলার সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক দুর্দ্দিনে, যে-দিনে ব্যক্তি-জীবনের বেদনার বাষ্পে সমাজ-জীবন বিষদগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, সেই দিনে, জীবনের ভাঙ্গনের তীরে

* *Cf* —'The idea of style is essentially and immutably *manner*, the whole manner, in which ideas are conceived and brought into the world as written words, manner of *thinking*, manner of *feeling* and manner of *expression*.'—*Lionel B. Burrows*.

বসিয়া, লেখকগণও এই ছন্দের মধ্যে 'আত্ম-প্রতিচ্ছবি' দর্শন করিলেন। যুগ-প্রবৃত্তির অস্থিরতা ও অস্বাচ্ছন্দ্য যেন এই ছন্দে মূর্তি লাভ করিল।

একেই তো শক্তিমান লেখক না হইলে এই ছন্দে কবির অপমৃত্যু, তাহাতে আবার শক্তিহীন কবিযশপ্রার্থীর অদম্য আগ্রহে এই ছন্দ লইয়া বাংলায় খুবই পরীক্ষা চলিতেছিল। বাংলার আসরের নূতন কবিগণও ইহাকেই যখন সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথও তাঁহাদের দলে নাম সহি দিলেন :—

'একদা কাব্যের পালা সুরু করেছি পদ্যে, তখন সে মহলে গদ্যের ডাক পড়েনি। আজ পালা সাঙ্গ করবার বেলায় দেখি, কখন অসাক্ষাতে গদ্যে-পদ্যে রফানিষ্পত্তি চলছে। যাবার আগে তাদের রাজিনামায় আমিও একটা সই দিয়েছি।' ¶

রবীন্দ্রনাথ 'শেষ-সপ্তকে'র একটী কবিতায় গদ্য-কবিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে বন্দিনী কবিতার প্রাণ নাই, অবেণী-সম্বন্ধ প্রগল্‌ভ সৌন্দর্য্যই ইহার প্রাণ—অসজ্জিত আটপহুরে পরিচয়ের নেশা-সৃষ্টিই, 'কোথাও মোটা, কোথাও সরু', ইহার উদ্দেশ্য। 'পুনশ্চ' কাব্যেও এই জাতীয় কবিতার পরিচয়-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, ইহাতে সুশ্রী, কুশ্রী, ভালোমন্দ একত্রে বসবাস করে, গর্জ্জন ও গান, তাণ্ডব ও তাল, একই সুর-মোহনায় মিশে। ইহা যে অশক্তের বিলাস নয়, এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথই বলেন—

একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ,
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে,
এর নানারকম গতি অবগতি।
বাইর থেকে এ ভাসিয়ে দেয়না স্রোতের বেগে
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরুলঘু নানা ভঙ্গীতে।

ইহার মধ্যে অনুভূতি বা আবেগের গভীরতা না থাকিতে পারে, স্বচ্ছন্দ-প্রবাহী ভাবোন্মত্ততা ইহাকে উচ্ছল-রসে বসায়িত না করিতে পারে,

¶ রবীন্দ্রনাথ : ছন্দ

কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটী স্তব্ধ অতল শান্ত মহিমা আছে, তাহা অনির্ব্বচনীয়। ইহাই পাঠককে চিত্রাত্মক স্থিতি-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করে ও তাহার চেতনাকে পুলকাবিষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেন—

এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে।

গদ্যকবিতার ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটী উক্তিই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে— 'সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্ব্বত্র। সেই গতি-ভঙ্গী আবাঁধা। ভিড়ের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে পোষাকী সাড়ির প্রান্ত তুলে-ধরা আধা ঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়। ····একথা মনে করা ভুল হবে যে, গদ্য-কাব্য কেবল মাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্য-ছন্দের মধ্যে আছে। ও যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লব-পুঞ্জের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাঁটা সাজানো নয়, অসম তার স্তবকগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য। †

গদ্য-কবিতা বা *Prose-Poetry* নামটি স্ব-বিরোধী কিনা, ইহা লইয়া বহু তর্ক হইয়াছে। তবে, এই ধরনের কাব্য একদিকে যেমন যুগোপযোগী, অপর দিকে তেমন, ইহার সাহায্যে 'কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব', এই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। রবীন্দ্র-নাথেরই কয়েকটী কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছে। এবং অতি-আধুনিক কয়েকজন লেখকও কয়েকটী উল্লেখযোগ্য গদ্য-কবিতা লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যাহার ভিত্তি স্থাপন করিলেন, তাহার সার্থকতা অনাগত ভবিষ্যতের হাতে। এই 'অর্দ্ধনারীশ্বর' কাব্যরূপ সম্বন্ধে জনৈক সুবিখ্যাত সমালোচক বলেন,—

'Unless the ear can detect that what is being spoken is *definitely not prose*, it is pedantic nonsense for the *vers libre* school to pretend that such writing has any advantage over plain prose.'

---

† রবীন্দ্রনাথ: ছন্দ

আধুনিক যুগ পরীক্ষার যুগ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে গদ্যকবিতা যথাযোগ্য স্থান লাভ করিতে পারিবে। কাজেই, প্রতীক্ষা দ্বারা ইহার মূল্য যাচাই করিতে হইবে। 'ভাষার গান ও ভাষার গৃহস্থালিকে' সমন্বয় করিবার যাহার শক্তি আছে, তাহার হাতেই এই কাব্যরূপ প্রাণবান্ হইতে পারে। এবং তখনই এই কথা আমাদেরও প্রত্যয়গোচর হইতে পারিবে যে, ইহার সাহায্যে অর্থ একটি সুসঙ্গত সংক্ষিপ্ত পরিধির মধ্যেই রূপ লাভ করে এবং লেখকের ব্যক্তি-মানসের সত্যকার প্রকাশ হয়— তাঁহার ষ্টাইল বা বাণী-ভঙ্গি শব্দের অর্থে, ধ্বনি-বৈচিত্র্যে ও চিত্র-নিপুণতায় রূপ লাভ করে।

১৭

হাস্যরস (Humour)

হাস্য-রস এক প্রকার ভাব-দৃষ্টি। ইহার সাহায্যে লেখক মানব-জীবনের অসঙ্গতি ও বৈষম্যকে এক সর্ব্বগ্রাহী উদার অনুভূতি দ্বারা গ্রহণ করিয়া আপাতবৈষম্যময় মানব-জীবনকেও ক্ষমা-সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করেন। জগৎ ও জীবনের প্রতি একটা নির্লিপ্ত অথচ অভিযোগ বা উচ্ছ্বাসহীন প্রসন্ন ও সহৃদয় মনোভাবই উৎকৃষ্ট হাস্যরসের লক্ষণ। হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, সাহিত্যিকগণ *wit, satire, irony, humour* প্রভৃতির সাহায্যে হাস্য-রস সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন।

হাস্যরস

মনে রাখিতে হইবে যে, সহানুভূতি ব্যতীত সত্যকার হাস্যরস সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক জীবনকে দূর হইতে দ্রষ্টার মত

প্রত্যক্ষ করেন। 'উৎকৃষ্ট হাস্যরসের মূলে একটা অতি উচ্চ রস-কল্পনা আছে। এইরূপ রস-কল্পনায় মানুষের প্রতি বা সৃষ্টির প্রতি নির্মম ব্যঙ্গের ভাব নাই; কারণ, অতি ব্যাপক সহানুভূতি এই হাস্য-রসের নিদান। এই ভাব-দৃষ্টির দ্বারা মানুষকে দেখিতে পারিলে তাহার সর্ব্ব অভিমান নিরর্থক বলিয়াই যেমন হাস্যকর হইয়া ওঠে, তেমন সেই হাসির অন্তরালে একটি সুগভীর সহানুভূতি প্রচ্ছন্ন থাকে— ঐ সহানুভূতি আছে বলিয়াই পরিহাসও 'রস' হইয়া উঠে, হাস্য-রস কবি-কল্পনায় অভিষিক্ত হয়।'

আমরা যখন হাস্য-রস সৃষ্টি করি, তখন ইচ্ছা করিয়াই অন্যকে পীড়ন করিতে চাই। এই পীড়নেচ্ছার পশ্চাতে স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্ব-বোধের আত্মপ্রসাদ আছে। যে-রাখাল বালক 'বাঘ আসিয়াছে', 'বাঘ আসিয়াছে' বলিয়া চীৎকার করিয়া হাস্য-রস সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল, তাহার মধ্যেও পরপীড়নেচ্ছা আছে। অনেক সময় আমরা অপরের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়া তাহার খরচায় হাস্য-রস উপভোগ করি। মনে করুন, কোন রবীন্দ্র-সাহিত্যাভিমানীর, (যিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিজেকে যথেষ্ট ওয়াকিফ্‌হাল বলিয়া মনে করেন), কাছে যখন কোন অজ্ঞাত কবির নিম্নোদ্ধৃত লাইন দুইটী আবৃত্তি করিয়া বলি, রবীন্দ্রনাথ সত্যই কী চমৎকার লিখেন—

> ভগবান বসি' হাসে শুধু যেন বিরাট বিফল হাসি,
> রোম নগর পুড়িছে যখন নীরো যে বাজায় বাঁশি।

—তখন যদি রবীন্দ্রভক্ত নিজের অজ্ঞতাকে গোপন করিয়া বলেন, 'তা না হ'লে কি আর রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু ?'—তখন আমরা শুধু স্মিত হাস্য করিয়া তাহার অজ্ঞতা উপভোগ করি। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, হাস্য-রসের একদিকে যেমন পরপীড়নেচ্ছা, অপরদিকে তেমন স্মিত-হাস্যের আত্মপ্রসাদ। এইজন্যই কমেডির নায়ককে একদিকে যেমন আমরা ভালবাসি, তেমনি আবার তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে আহত ও লাঞ্ছিত দেখিতেও ইচ্ছা করি।

ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসঙ্গতি, কথার সহিত কার্য্যের অসঙ্গতি—প্রভৃতিই হাস্য-রসের উপজীব্য এই কথা

পূর্ব্বেও বলিয়াছি। এই অসঙ্গতি-বোধ অধিকাংশ স্থলে কোন না কোন ঘটনা বা চরিত্র-ঘটিতও হইতে পারে। কোন অভাবিত বা বিস্ময়কর ঘটনা (যেমন আম পাড়িবার জন্য কোন বৃদ্ধের গাছে ওঠা), কোন দৈহিক-বিকৃতি, কাহারও কোন বস্তু-সম্বন্ধে ভ্রান্তি (যেমন, দীনবন্ধুর 'জামাই বারিকে' পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী কর্ত্তৃক চোরকে স্বামীভ্রমে লাঞ্ছনা করা), প্রভৃতি হইতে হাস্য-রস সৃষ্টি হইতে পারে।

Wit, Humour ও Fun, Irony

Wit বা বৈদগ্ধ্য বলিতে আমরা মার্জ্জিত বুদ্ধির বাক্-চাতুর্য্যকে বুঝি। লেখক যখন দুইটী নিঃসম্পর্কিত বস্তুর মধ্যে সহসা কোন সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়া শব্দের সাহায্যে তাহা প্রকাশ করেন, তখন তাহাকে *Wit* বলি। ‡ *Wit* সৃষ্টি করিতে লেখকের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও শব্দ-নৈপুণ্যে প্রয়োজন হয় ইহাতে যে আনন্দ বা বিস্ময়-সঞ্চার করা হয়, তাহাতে সামান্য মাত্র পীড়ন থাকে। হেঁয়ালী প্রভৃতিতে *Wit* প্রচুর দৃষ্টি হয়। *Wit* সামান্য শব্দ-ব্যঞ্জনায় হাস্য-রস উদ্রেক করে, *Humour* সমস্ত অনুভূতিকে আন্দোলিত করিয়া সহানুভূতিশীল হৃদয়ে আবেদন জানায়। *Wit* বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃতির পরিচায়ক, *Humour* যাহা অদ্ভুত, তাহাকে সস্নেহ ভাবে গ্রহণ করে। *Humour*-এ আঘাত নাই, প্রসন্ন আনন্দ-বোধ বা বেদনা-বিধৌত নির্লিপ্ত হাসির ব্যঞ্জনা আছে।

এই *Humour* করুণ রসাশ্রিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সুগভীর ও উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়। প্রতিকারহীন দৈন্যদুর্দ্দশার মধ্যেও লেখক যখন ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনাকে জীবনের প্রতি কোন অভিযোগ বা আক্ষেপহীন ভাবদৃষ্টির সাহায্যে পাঠকের মনে রস-সঞ্চার করেন, তখন এই শ্রেণীর হাস্য-রস সৃষ্টি হয়। লেখকের হাস্যোচ্ছল লঘুতায় তখন বেদনার সকরুণ দীপ্তি রামধনু-সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে—তাই তাঁহার হাসির পশ্চাতে

‡ *Cf*. 'A person always seeks the ingenious and the remote when he wants to be witty'— *V K. Menon A Theory of Laughter*.

অশ্রুবিন্দু ঝলমল করিয়া উঠে। Charles Lamb ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এই শ্রেণীব হাস্য-রসের নিদর্শন পাওয়া যায়।

লেখক যখন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ক্ষণতরে তাঁহার পারিপার্শ্বিককে তাঁহাবই আনন্দের উপকরণ বা উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেন, তখন তিনি *Fun* বা কৌতুক সৃষ্টি কবিতে পারেন। *Irony*-তে লেখক কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না এবং পরোক্ষ অর্থটী মাত্র ইঙ্গিত করেন। শবৎচন্দ্রেব 'দত্তা' নামক উপন্যাসে 'রাস-বিহারীর' চরিত্র Irony-ব (সোৎপ্রাস উক্তি) উৎকৃষ্ট উদাহবণ। 'রাসবিহাবীর' অত্যুগ্র ভগবৎ-প্রীতিব অন্তবালে হীন স্বার্থ-বোধকে ইঙ্গিত করাই এইস্থলে লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য। ইংবেজী সাহিত্যে Irony সৃষ্টিতে Dean Swift অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বাংলা সাহিত্যে হাস্য-বস

বাংলা সাহিত্যে হাস্য-বসেব একান্ত অভাব। যাহা কিছু আছে তাহাও অধিকাংশ স্থলে জৈব-ব্যাপাব ও যৌন-ব্যাপারকে ইঙ্গিত করিয়াই প্রকাশিত হয়। খাদ্যদ্রব্য ও পেটুক-প্রবৃত্তি লইয়া অশেষ হাস্যরস-মধুব সাহিত্য বাংলায় আছে। 'বাসর-ঘবে কর্ণমর্দ্দন ও অন্যান্য পীডন নৈপুণ্যকে বঙ্গসীমন্তিনীগণ এক শ্রেণীর হাস্যরস বলিয়া স্থির কবিয়াছেন।' সত্যকাব যে শুভ্র নির্ম্মল সংযত হাস্যরস, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ও ববীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্যত্র তুর্লভ।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'গজপতি বিদ্যাদিগ্গজ,' তাবকনাথেব 'গদাধব' ও 'নীলকমল' এবং দীনবন্ধুব 'নিমচাঁদ' অপূর্ব্ব হাস্য-রসাত্মক সৃষ্টি। এতদ্ব্যতীত, চন্দ্রনাথ বসুর 'পশুপতি সংবাদ', কালীপ্রসন্নের 'ভ্রান্তি-বিনোদ', ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু' ও 'ক্ষুদিরাম', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ফোক্‌লা দিগম্বর', রসরাজ অমৃতলাল বসুর প্রহসনগুলি, ববীন্দ্রনাথেব 'হাস্য-কৌতুক', 'ব্যঙ্গ-কৌতুক', দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান', ও প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কতকগুলি গল্প রস-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালের বস-স্রষ্টাদেব মধ্যে বীরবল, পরশুরাম প্রভৃতিব নাম কবা যাইতে পারে।

১৮

সাহিত্যে সাব্লিমিটি

সাব্লিমিটি সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত অনেকেই এত বিভিন্ন কথা বলিয়াছেন যে, ইহার সম্বন্ধে ধারণা কবা সুসাধ্য নহে। এই সম্বন্ধে বিচিত্র মতামতের একমাত্র কারণ এই যে, অনেকেই সুন্দর ও সাব্লাইমের বিভেদ সম্বন্ধে নিশ্চিত নহেন। বিষয় অবতারণা-প্রসঙ্গে কেবল এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, সুন্দর ও সাব্লাইমের পার্থক্য শুধু মাত্রাগতই নহে, শ্রেণীগতও। সৌন্দর্য্য যখন আমাদিগকে যুগপৎ ভীম ও কান্ত এমন এক রসাবেশে অভিভূত করিয়া 'লোকোত্তর চমৎকারের' * সাক্ষাৎ করাইয়া দেয়, তখন সেই বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যকে আমরা সাব্লাইম্ বলি। সৌন্দর্য্য আমাদিগকে শান্ত, মুগ্ধ ও স্তব্ধীভূত কবে, সাব্লাইম্ আমাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে সহসা বিপ্লব ঘটাইয়া আমাদিগকে উদ্ধাভিমুখে উন্নীত কবে। সৌন্দর্য্যানুভূতি আমাদের চিত্তকে প্রশমিত করিয়া দেয়, সাব্লাইম্ প্রথমতঃ আমাদের মধ্যে তীব্র ভাবাবেগের বিক্ষোভ সৃষ্টি কবে।

সাব্লিমিটি বলিতে বস্তুগত রূপবৈভব এবং বস্তুর বর্ণনাভঙ্গী—দুইটিকেই বুঝা যাইতে পারে। কোন বস্তুর বস্তুগত বিরাটত্বের পরিমিতি-মহিমাকে ক্যাণ্ট্ *'mathematical sublime'* ও উহা বিশালতার ব্যঞ্জনায় দর্শকের যে চিত্ত-বিস্ফার সৃষ্টি করে, তাহাকে *'dynamic sublime'* বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুগত (Objective) ও আত্মগত (Subjective) সাব্লিমিটির পার্থক্য স্বীকার করিয়াও ক্যাণ্ট্ মূলতঃ আত্মগত বা কবির মনোগত সাব্লিমিটির উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। ‡

---

* সাহিত্যদর্পণ

‡ *Cf:* True sublimity must be sought only in the mind of the judging Subject, and not in the Object of nature —*Kant*.

বস্তুগত সাব্‌লিমিটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যাহা নিরপেক্ষভাবে বৃহৎ অথবা যাহার তুলনায় অন্য সকলই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, তাহাই সাব্‌লাইম্‌। অধ্যাপক Bradley-র মতে, সীমাহীন মহত্ত্ব ও বৃহতের ভাবসঞ্চারই সাব্‌লাইমের লক্ষণ। তিনি বলেন যে, কোন সাব্‌লাইম্‌ জিনিস প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের মনে প্রথমতঃ এক অদ্ভুত রকমের বেদনা বা ব্যর্থতাবোধ জন্মে এবং নিজের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে আমাদের প্রতীতি হয়। কিন্তু ক্ষণপরেই ক্ষুদ্র হইয়াও বৃহতের সংক্রামণে আমরা বৃহৎ হইয়া উঠি এবং উহার সহিত একাত্মতা অনুভব করি। বলা বাহুল্য মাত্র যে, অধ্যাপক Bradley এইখানে বস্তুগত সাব্‌লিমিটিও স্বীকার করিয়াছেন।

অভাবনীয় পরাজয়ের মধ্যে বিষাদাত্মক নাটকের নায়কের আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার যে মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা, মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়াও তাহার নচিকেতা-সুলভ যে অমৃতাকাঙ্ক্ষা, তাহাকেই হেগেল সাব্‌লাইম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পরাজয়ের মধ্যে মহত্ত্বের জন্য মানবাত্মার যে ক্রন্দন, তাহাই মহিমময়। কিন্তু পরাজয়ের তীরে বসিয়া নিঃসহায় মানবাত্মার ক্রন্দন যতই মর্ম্মস্পর্শী হউক না কেন, তাহার মধ্যে সাব্‌লিমিটি থাকে না। স্বর্গচ্যুত শয়তান যখন *'To be weak is miserable'*— এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবানের বিরুদ্ধে পর্য্যন্ত শক্রতা করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প, তখন সে ধ্বংসের মধ্যেও মহান। বার্ক ‡ বলেন যে, সাব্‌লিমিটিতে বেদনা ও ভয় থাকিবেই। আমরাও বিশ্বাস করি যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ভীতিও বেদনামিশ্রিত আনন্দ দান করে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দুইটি না-ও থাকিতে পারে। নক্ষত্র-খচিত বিরাট আকাশে ভয় বা বেদনার এতটুকু আভাস নাই, অথবা মানবোচিত যে সকল গুণ আমরা শ্রদ্ধা করি, তাহাদের বিরাটত্বে আমরা যখন অভিভূত হই, তখন তাহাদের মধ্যেও কোন বেদনা বা ভয়ের কারণ থাকে না। আবার, অসুস্থ লোকের উপর অস্ত্রোপচারে ভয় থাকিলেও সাব্‌লিমিটি নাই; সর্প দংশনে ভয় বা বিপদ আছে সত্য,

‡ Terror is in all cases, whatsoever, either more openly or latently, the ruling principle of the sublime— *Burke*.

কিন্তু এই ব্যাপারকে কেহই সাবলাইম বলিতে স্বীকৃত হইবেন না। আর একটি কথা এই যে, কোন বস্তু ভীতিপ্রদ হইলেই উহা সাবলাইম হয় না। দর্শক উহা হইতে নিজেকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিরাপদ মনে না করেন, ততক্ষণ ভীতিকে আস্বাদ্যমান রূপে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না। এইজন্যই যিনি প্রাকৃতিক উৎপাত ভয় করেন, তাহার নিকট ঝড় ভয়ানক; যিনি ইহাকে ভালবাসেন এবং প্রকৃতিরই শক্তিমত্তার অপূর্ব্ব বিকাশ রূপে প্রত্যক্ষ করেন, তাহার নিকটই উহা সাব্‌লাইম। সুতরাং ভয় বা বেদনা যতক্ষণ পর্য্যন্ত দূরসংস্থিত বা আপন্মুক্ত হইয়া কান্তরূপ পরিগ্রহ না করে, ততক্ষণ উহারা সাবলাইম-এর স্তরে পৌঁছিতে পারে না। অজিত চক্রবর্ত্তী বলেন, 'সৌন্দর্য্যই অসীমের দিক দিয়া মহান' †। এই উক্তির মধ্যেও সৌন্দর্য্য ও সাবলিমিটি—এই দুইয়ের পার্থক্য-জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে। যাহা আমাদিগকে অসীমের মধ্যে আনয়ন করে, তাহা যদি আমাদিগকে কান্ত, স্নিগ্ধ ও মধুর রসে আপ্লুত করে, তবে উহা সাবলাইম নয়। যে অসীমতার মধ্যে একরূপ শক্তিশালী ভাববিপর্য্যয় সৃষ্টির ক্ষমতা নাই, তাহা সুন্দর হইলেও সাবলাইম নয়। ক্যাণ্ট সত্যই বলেন যে, সীমাহীনের ইঙ্গিতের মধ্যেও *'thought of its totality'* বা পূর্ণাবয়ব-কল্পনা থাকিতে হইবে। শুধু অসীম বলিলে ভাব-কল্পনার সীমাহীন বিস্তার বুঝায়, কিন্তু কোন বস্তুর পূর্ণ রূপমণ্ডলকে বুঝায় না।

ইতিপূর্ব্বে আমরা বিশিষ্ট মনীষীদের মতামত আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, সাবলিমিটির প্রধান লক্ষণ বৃহতের পরিব্যঞ্জনা। অনেকে আবার আয়তনের বিশালত্বের উপরে বিশেষ ঝোঁক দেন। কিন্তু প্রকাণ্ড সমতলভূমি কখনো তেমন বৃহতের আভাস জাগায় না। বরং উন্নত পর্ব্বতভূমি ও সুগভীর পর্ব্বত-গহ্বরে বৃহতের আভাস অনেক বেশী। সমতলভূমির মধ্যে যে সামঞ্জস্যবোধ এবং ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য আছে, তাহা তাহাকে সুন্দর করে, মহিমময় করে না। নক্ষত্রখচিত সীমাহীন নীল আকাশ যে বৃহতের ভাব জাগায়, তাহার কারণ উহার উচ্চতা ও ব্যাপ্তি।

† বাতায়ন

সুতরাং দৈর্ঘ্য অপেক্ষা উচ্চতা ও ভেধ অধিকতর বৃহত্ত্বব্যঞ্জক। সুদূর-বিসর্পী রকি পর্ব্বত অপেক্ষা হিমালয়ের সু-উন্নত দুর্ভেদ্য ধ্যান-মহিমা অধিকতর মহত্ত্বব্যঞ্জক। সমুদ্রের মধ্যে যে সাব্‌লিমিটি আছে, তাহার মূলে উহার অমিত-বিস্তার, গতিশক্তি ও তরঙ্গ-ভঙ্গের উদ্দামতা। এইজন্যই মনে হয়, চিল্কার শান্তসলিলে সৌন্দর্য্যের নিভৃতি-স্পর্শ থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গোপসাগরের ভৈরব গর্জ্জনে ও সীমাহীন ব্যাপ্তিতে বৃহতেরই ব্যঞ্জনা। গঙ্গা সুন্দর, পদ্মা সাব্‌লাইম; শোভাযাত্রার অশ্ব সুন্দর, রণ-সজ্জার অশ্ব সাব্‌লাইম। সুতরাং আসল কথা হইল, আকারের বিশালতা অপেক্ষা বস্তু-নিহিত শক্তিমত্তার যে অতিলৌকিক প্রবলতাকে *Lessing* 'transcending the human' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, তাহাই সাব্‌লিমিটি-ব্যঞ্জক।

এইজন্যই মানুষের কোন কোন গুণ যখন আমাদের মধ্যে অলৌকিক চমৎকার সৃষ্টি করে, তখনই তাহাকে আমরা সাব্‌লাইম বলি। সাধারণ লোকের দুঃখ, প্রেম, ত্যাগ, বীরত্ব ও বীর্য্য আমাদিগকে তেমন ভাবে অভিভূত করে না। কিন্তু যখন দেখি, সেই দুঃখ, প্রেম, ত্যাগ, বীরত্ব ও বীর্য্যের মধ্যেও এক বিরাট শক্তির স্ফূরণ হইতেছে, তখন উহাকে আমরা সাব্‌লাইম না বলিয়া পারি না। এইজন্যই ভবভূতির রামচন্দ্রের বেদনা-বিক্ষুব্ধ বিলাপে, 'বিদায় অভিশাপের' দেবযানীকে অভিশপ্ত কচের বর প্রদানে, 'প্রার্থনাতীত দানে' বেণীর সঙ্গে মস্তকদানে, বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের নিকট পরাজিত পুরুর আত্মদৃপ্ত প্রত্যুত্তরে আমরা সাব্‌লাইম ভাব-কল্পনাকে অস্বীকার করিতে পারি না।

এখন আমরা সাব্‌লিমিটির প্রকাশভঙ্গি সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলিব। প্রকাশভঙ্গি বিষয়বস্তুর উপরে নির্ভর করে, ইহা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। সাব্‌লাইম রচনার বিষয়বস্তু দীনহীন বা তুচ্ছ কোন পদার্থ হইতে পারে না। ইহার বিষয়বস্তু মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক অর্থাৎ যাহাতে কোন মহান ভাবকল্পনার উদ্রেক করিতে পারে, তেমন কোন প্রবল শক্তি-সঞ্চারী বস্তু হইবে। বিষয়ের মর্য্যাদানুরূপ যথাপ্রয়োজনীয় উপমা, অলঙ্কার, শব্দচয়ন, চিত্রাত্মক

কেননা, ছন্দকুশলতা ও ভাষাবিন্যাস এমন ভাবে রূপায়িত হওয়া চাই যে, বর্ণনাটির মধ্যে যেন লেখকের বিরাট উপলব্ধির প্রতিধ্বনি * পাওয়া যায়। লেখক অসংলগ্ন এবং অযত্ন-গ্রথিত শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন, এবং এমন কোন শব্দ ব্যবহার করিবেন না, যাহাতে তাঁহার সৃষ্টি-কর্ম্ম অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। লেখক নিজে বিষয়-বস্তু গৌরবে কতখানি অভিভূত হইয়াছেন, উহার উপর তাঁহার সাব্‌লাইম-রস পরিবেশন ক্ষমতা নির্ভর করে। লেখক যদি সত্য করিয়া কোন মহানতার সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, তবে অলীক অলঙ্কার-বাহুল্য বা শব্দসম্ভারের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় না। তাঁহার ভাষা সহজ স্বচ্ছতা ও পরিমিতি-বোধ রক্ষা করিয়াই এক পূর্ণ-মণ্ডল ভাবৈশ্বর্য্য সৃষ্টি করে। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিচিত্র স্বাধীনতা ও নমনীয়তাই সাব্‌লাইম ভাবপ্রকাশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

মিল্টনের Satan-এর নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা সাব্‌লাইম ভঙ্গির উৎকৃষ্ট নিদর্শন—

He above the rest,
In shape and gestnre proudly eminent,
Stood like a Tower : his form had not yet lost
All her original brightness, nor appear'd
Less than archangel ruined ; and the excess
Of glory obscur'd : As when the sun, new risen,
Looks through the horizontal misty air,
Shorn of his beams : or, from behind the moon,
In dim eclipse, disastrous twilight sheds
On half the nations, and with fear of change
Perplexes monarchs. Darken'd so, yet shone
Above them all the Archangel—

উদ্ধৃত কবিতাংশে বিষয়বস্তু প্রকৃতই মহৎ—প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী দানব-শক্তি অবদমিত হইয়াও উন্নতশির, এবং ঘোর বিপন্ন অবস্থায়ও আত্মপ্রতিষ্ঠ।

---

* 'Sublimity is the echo of a great soul'— *Lessing*.

এই অনমনীয় শক্তির অভাবনীয় পরিবর্ত্তন রাহু-কবলিত সূর্য্যরশ্মির সহিত তুলনা করিয়া যুগপৎ অন্ধকার ও ভীতির সঞ্চার করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, কবি সহজ স্বাভাবিক অথচ ওজস্বী ছন্দে বিষয়বস্তুটিকে বর্ণনা করিয়াছেন। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'ও ঠিক এমনি এক বিপুল শক্তিশালী রাজার চিত্র দেখিতে পাই। অদৃষ্ট যাহার প্রতি বিরূপ, নিজের রাজ্য ধন, সহায়, সম্পদ যাহার চক্ষুর সম্মুখে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে, সেই সর্ব্বহারা রাবণের মুখে মধুসূদন যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও তেমনই মহিমোজ্জ্বল—

"এ কাল সমরে
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে,
রাক্ষস কুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি।
অরাবণ অরাম বা হবে ভব আজি!

অথবা রবীন্দ্রনাথের ঝঞ্ঝারূপ-বিগ্রহ প্রকৃতই সাব্‌লাইম—

হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে
ব্যাপ্ত করি, লুপ্ত করি, স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোর স্তূপে।

* * * *

রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজসম
গর্ব্বিত নির্ভয়,
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম
জয় তব জয়।

আবার, চিরচঞ্চলা বারবনিতা-শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতে যে ক্লিওপেট্রা কুণ্ঠাবোধ করে নাই, প্রেমের দুর্জ্জয় আহ্বানে মরণ-মহোৎসবে মৃত্যু-রমণ-পিপাসা-কাতর তাহারই মুখ হইতে যখন শুনি—

Give me my robe, put on my crown ; I have
Immortal longings in me......... ,

Methinks I hear
Antony call ; I see him rouse himself
To praise my noble act : I hear him mock
The luck of Caesar, which the gods give men
To excuse their after-wrath : husband, I come
I am fire and air ; my other elements
I give to baser life——

তখন মনে হয়, সেক্স্‌পীয়রের কল্পনায় ভারতীয় সাংখ্যদর্শনের চিরন্তন 'প্রকৃতি'-রহস্য মানবীরূপে ধরা দিয়াও, শুধু সুন্দর নয়, মহিমময় হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের—

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর—

সুন্দর, কান্ত, অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু জন-নিধন-প্রবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনা—

অনাদিমধ্যান্তম্ অনন্তবীর্য্যম্
অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশ বক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥
দ্যাবা পৃথিব্যোরিদম্ অন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ (গীতা, ১১।১৯-২০)

অথবা, উপনিষদোক্ত আত্মার বর্ণনা—

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাহস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্। (কঠোপনিষদ, ১।২।২০)

সাব্‌লাইম্ হইতেও সাব্‌লাইম্।

১৯

সাহিত্যে মিষ্টিসিজম্ (Mysticism)

সাহিত্যে মানুষের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ধ্যানধারণা রূপ-পরিগ্রহ করিয়া কায়াকান্তিময় হইয়া উঠে, ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে পরিগণিত। সাহিত্যিক জীবন ও জগতের রূপ-সৌষম্য দান করিতে সাধারণতঃ বুদ্ধি বা অনুভূতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, তিনি ইন্দ্রিয় বা মনের সাহায্যে সত্যের গুহাহিত মর্ম্মটী উদ্ঘাটন করিয়া উঠিতে পারেন না—বার বার করিয়া তাঁহার 'কাঙ্গাল-নয়ন' সত্য-দীপ্তির নিকট হইতে ফিরিয়া আসে—তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয় তাঁহাকে ব্যর্থতায় বিমূঢ় করিয়া দেয়, এবং তাঁহার মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কল্পনা সেই তুরীয় মার্গে উপনীত হইতে পারে না। অথচ, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে সত্য-শিহরণ তিনি উপলব্ধি করেন, তাহার সত্যতা-বিচার জ্ঞানে নয়, বুদ্ধিতে নয়, মেধায় নয়, প্রজ্ঞায় নয়, বোধিতে (*Intuition*)।

এই বোধি-দৃষ্টি নির্ব্বিশেষকে (*Universal*) সন্দর্শন করেনা, বিশেষকেই (*Particular*) কাল ও ব্যাপ্তি-(*Time* and *Space*) -সীমানার মধ্যে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু মিষ্টিক সীমার মধ্য হইতে সীমাহীন অপরূপের স্বাদ গ্রহণ করিয়া অনুভব করেন—

সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি'।

বুদ্ধিনিষ্ঠ জনমন ইহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না— কারণ, ইহার ভাষা জ্ঞানীর বা ভাবুকের ভাষা নয়, ইহার ভাষাকে আমরা 'সন্ধ্যা ভাষা' বা 'আলো-আঁধারি ভাষা' নামে আখ্যাত করিতে পারি। কবি উপমা ও

প্রতীকের সাহায্যে অবাঙ্‌মনসগোচর সেই সত্তাকে গোধূলি-আলো-পরিম্লান রহস্যাচ্ছন্ন ভাষায় আমাদের নিকট উপস্থাপিত করেন। সত্যকে, সমুচ্চকে মানুষ যে ধরিতে চায়, পাইতে চায়, এবং উহার সহিত অভিন্নতা সৃষ্টি করিয়া একাত্ম হইতে চায়, ইহা মনের সংযোগে নয়, বুদ্ধির সংযোগে নয়—বোধি-দৃষ্টির ফলেই সম্ভব হইতে পারে। এই দৃষ্টি-সম্ভূত অনুভূতি একপ্রকার প্রাতিভ জ্ঞান—কাল ও ব্যাপ্তির অতীত এক প্রকার দিব্যানুভূতি—

বিচিত্র এ মত্তদশা,
ভাবভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে!

এই দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন কবি তর্ক করেন না, যাচাই করেন না, পরীক্ষা করেন না, বরং সত্যকে অপরোক্ষ করেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিশ্বাস করেন, গ্রহণ করেন।

বিচারের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা পরমপুরুষ ও কবির মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়; এইজন্যই বিচারের অতীত বোধি-দৃষ্টির সাহায্যে কবি নিজেকে পরম সত্তার সহিত একীভূত করিয়া অনুভব করেন। বোধি-দৃষ্টি-সম্পন্ন কবি একান্তভাবে অহং-চৈতন্য বিলুপ্ত, এবং বিলুপ্তির মধ্য দিয়াই তাঁহার পরম প্রাপ্তি সংসাধিত হয়। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, মিষ্টিক কবি বিশ্ব-জগৎ ও আত্ম-জগতের মধ্যে কোন দ্বন্দ্বকেই স্বীকার করেন না; বিশ্ব ও আত্ম-জগৎ যেন একটী সুষম, সঙ্গতিপূর্ণ, পরম সমন্বিত অখণ্ড সত্যরূপে তাঁহার কাছে প্রতিভাত। ভগবান তাঁহার কাছে কোন পৃথক বস্তু-সত্তা নয়; ভগবৎ অনুভূতিও যেন তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত আত্ম-দর্শন মাত্র। কবি যখন এইরূপ একটী অখণ্ড চিন্ময়-লোকে উপনীত হন, তখন তিনি ভোক্তা নহেন, রূপ-পূজারী নহেন, দ্রষ্টাও নহেন—ভাবলোকে উত্তীর্ণ এক বিদেহী বিশ্ব-চৈতন্য। কাজেই ব্যক্তি ও বস্তুর বিভিন্নতা তখন তাঁহার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই সমাধি-অবস্থাতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যেমন *'central peace at the heart of things'* অনুভব করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমন বিশ্বের চির-চলিষ্ণুতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু,
ঘূর্ণীর মাঝখানে।

রোমান্টিক বা কল্পনা-বিলাসী কবি যাহাকে বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখেন, মিষ্টিক তাহাকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সমাহিত সান্ধ্য-সৌন্দর্য্যে অনুভব করেন। এই অনুভূতির মধ্যে আত্ম-বোধের পীড়ন নাই, আত্মাহুতির 'অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতি' আছে। সুতরাং, যে-অখণ্ড দৃষ্টির সাহায্যে কবি ভগবৎসত্তা, তথা বিশ্ব-সৃষ্টির পরম সত্যকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত একাত্মতার পরম আনন্দ লাভ করিতে পারেন, সাহিত্যে সেই বোধি-দৃষ্টি-সাধনাকে আমরা **মিষ্টিসিজম্** নামে অভিহিত করিতে পারি। বলা বাহুল্য, ইহা কোন মতবাদ নয়, সত্যানুভূতির দৃষ্টি-প্রদীপ মাত্র।

সাধারণতঃ, ভক্তি, প্রেম, প্রকৃতি বা সৌন্দর্য্য-মূলক সাহিত্যে মিষ্টিসিজমের স্পর্শ থাকিতে পারে। আমরা ইহাদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিব।

এই বোধি-দৃষ্টি-বশতঃই দেহতত্ত্ববিদ ভক্ত বাউল-কবি গাহিয়াছেন—

দেল দরিয়া খবর কররে মন।
তোর কোথা বৃন্দাবন, কোথা নিধুবন, কোথায় রে তোর গুরুর আসন।
যদি পদ্মা পারি দিবি, তবে ঢাকা দেখতে পাবি,
মুখসুধাবাদ কররে অন্বেষণ।
আছে কলিতে কলিকাতা, তিন সহরে আটা,
সাঁতার দে যায় রসিক যে জন। ¶

এবং এই দৃষ্টি বলেই ব্লেক্ পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন—

If they (angels) see any weeping
That should have been sleeping,
They pour sleep on their head,
And sit down by their bed.

¶ অক্ষয়কুমার দত্ত : ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়

যে প্রেম-দৃষ্টি বলে 'গৃহিণী, ভগিনী ও দেবীরূপে' ইংরেজ কবি তাঁহার প্রেমিকার পূজা করিতে পারেন, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর দিব্যদৃষ্টি বলে বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাস তাঁহার প্রেমিকা-বন্দনায় গাহিতে পারেন—

তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃপিতৃ
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী।

বিহারীলালের প্রেমারতি আরও সুগভীর ধ্যান-দৃষ্টি-সম্ভূত—

কে তুমি জননী, পিতা,
নন্দিনী, রমণী, মিতা,
প্রেম-ভক্তি-স্নেহ-রস-উদার-উচ্ছ্বাস
কে তুমি মা জল-স্থল,
মহান্ অনিলানল,
নক্ষত্র-খচিত নীল অনন্ত আকাশ ?
কে তুমি ? কে তুমি এই বিরাট বিকাশ ?

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতি-পূজায় তপোমগ্ন দৃষ্টিবলে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে এক অখণ্ড হৃদয়-নন্দিনীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

And I have *felt*
A presence....... ....
* * *
A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things.

প্রকৃতি-বন্দনায় রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক-দৃষ্টি বলেই প্রকৃতির মধ্যে সুন্দরের আবাহন করিতেছেন—

হের গগনের নীল শতদলখানি
মেলিল নীরব বাণী।
অরুণ-পক্ষ প্রসারি' সকৌতুকে
সোনার-ভ্রমর আসিল তাহার বুকে
কোথা হ'তে নাহি জানি।

সাহিত্যে মিষ্টিসিজম্

যে-দৃষ্টিতে বৈষ্ণবকবি সমস্ত বিশ্বকে এক রাধা-ধাতুতে গঠিত দেখিয়াছেন, তাহার অনুরূপ দৃষ্টি-আলোকেই শেলী বিশ্ব-সৃষ্টিকে এক অখণ্ড সৌন্দর্য্য-ধাতু রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

And my spirit... ....
Interpenetrated lie
By the glory of the sky ;
Be it love, light, harmony,
Odour, or the soul of all
Which from Heaven like dew doth fall,.
Or the mind which feeds this verse
Peopling the lone universe.

রবীন্দ্রনাথও সমন্বয়ী-দৃষ্টির আলোকে সৌন্দর্য্য-পূজা সমাপন করিয়াছেন—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিনী।
অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তর-ব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন-মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।

ইতিপূর্ব্বে আমরা ভক্তি, প্রেম, প্রকৃতি, সুন্দর-পূজা প্রভৃতি বিষয়ক কাব্যে বিভিন্ন কবির মিষ্টিক দৃষ্টি-ভঙ্গির উল্লেখ করিয়াছি। এই স্থলে একটি প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজনীয়। অনেকে মনে করেন যে, ধর্ম্ম বা ভগবান সম্বন্ধীয় সাহিত্য ব্যতীত কখনো মিষ্টিসিজম্ দৃষ্ট হয় না। (অবশ্য, মধ্যযুগের ভারতীয় মিষ্টিক-সাধনা ও পারস্যের আবু সাঈদ্, হাল্লাজ্, হাফিজ, জালালুদ্দীন্, রুমী প্রভৃতি সুফী-মতাবলম্বীদের সাধনায় ধর্ম্মের সংযোগ আছে)। কিন্তু এই

ধারণা আংশিকভাবে সত্য। কারণ, ভগবান সম্বন্ধে কতকগুলি সুস্পষ্ট স্থূল ধারণা প্রায় প্রত্যেকেরই আছে। ভগবানের জন্য মানুষের সহজ বা সুলভ উচ্ছ্বাসময় আকুতির মধ্যে মিষ্টিক-দৃষ্টি নাই—'রূপসাগরে ডুব দিয়ে' অরূপ-রতন-সন্ধানী দৃষ্টি বরং অনেকটা মিষ্টিক-দৃষ্টি সম্ভূত। এতদ্ব্যতীত, অনেকে মনে করেন যে, যাহা দুর্ব্বোধ্য কিংবা সহজবোধ্য নয়,' অথবা যাহা দার্শনিক তত্ত্বঘটিত, তাহাই মিষ্টিক-দৃষ্টি প্রসূত। ইহাও সর্ব্বাংশে সত্য নয়। কারণ, দর্শনের উদ্দেশ্যও সত্য আবিষ্কার—দার্শনিক সত্যকে কোন রহস্যাচ্ছন্ন 'আলো-আঁধারি-অন্তরাল'-নিহিত রূপে গ্রহন করেন না। যাহা অসম্ভব, অভাবনীয় বা অতি-প্রাকৃত বলিয়া আপাততঃ মনে হয়, তাহাকেও তিনি কোন নিয়মাধীন করিয়া ব্যাখ্যা করিতে না পারিলে তাঁহার সত্য-সন্ধানের উদ্দেশ্যকে তিনি ব্যর্থ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মিষ্টিক বিশ্ব-চেতনা ও অহং-চেতনা এক পরম শক্তি-বিধৃত রূপে প্রত্যক্ষ করেন—জ্ঞানের দ্বারা নয়, বোধি দ্বারা।

সর্ব্বশেষে আমরা বলিতে পারি যে, বোধি-দৃষ্টির ফলেই সমুচ্চ অনন্ত সত্তার সহিত সান্ত মানবসত্তার বিভেদ তিরোহিত হয়। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়কে, পরমকে জানিতে হইলে জ্ঞানের দ্বারা সম্ভবপর নয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিযাছি। বিজ্ঞানের দম্ভ এইখানে পরাজিত, কারণ বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলের সৃষ্টি কবিয়া অশেষ প্রকার সংশয়াচ্ছন্ন মতবাদের সৃষ্টি করিতে পারে। *Agnosticism* বা অজ্ঞেয়তাবাদই বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার চবম মীমাংসা। পরমকে জানা ও পরম হওয়া বলিতে যাহা বুঝায় অর্থাৎ জানা (*Knowing*) যখন হওয়ার (*Becoming*) সহিত অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য হইয়া উঠে, সেই ধ্যানদৃষ্টি-সম্ভূত চরমাবস্থার কথা বিজ্ঞান ভাবিতে পারে না। যোগী যাহা ধ্যানে ও কবি যাহা নেশায় পাইয়া থাকেন, সেই অহং-বিলুপ্ত তন্ময়াবস্থা মিষ্টিকের স্বকীয় অনুভূতি। শ্রুতি যাহাকে পরাবিদ্যা বলেন ইহাও বোধ হয় তাহাই।

গ্রন্থ-পঞ্জী

(* অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলীর নামমাত্র প্রদত্ত হইল).

Abercrombie : Principles of Literary Criticism
: The Theory of Poetry
Alexander : Beauty and other forms of Value
Aristotle : Poetics
Arnold : Essays in Criticism (1st & 2nd Series)
Atkins : English Criticism
Bradley : Oxford Lectures in Poetry
Caudwell : Illusion and Reality
Coleridge : Biographia Literaria
Croce : The Essence of Æsthetic
De : History of Sanskrit Poetics
Eliot : The Use of Poetry
Garrod : Poetry and the Criticism of Life
Hudson : Introduction to the Study of Literature
Hume : Essay on Tragedy
Keith : Classical Sanskrit Literature
Maugham : The Summing Up
Meredith : An Essay on Comedy
Murry : The Problem of Style
Nicoll : The Theory of Drama
Nietzsche : The Birth of Tragedy
Pater : Appreciations
Richards : Principles of Literary Criticism
Schopenhauer : Essays
Sen : Western Influence on Bengali Literature
Underhill : The Elements of Mysticism
Winchester : Some Principles of Literary Criticism
Worsfold : The Priciples of Criticism
Yeats : Ideas of Good and Evil

অতুলচন্দ্র গুপ্ত : কাব্য-জিজ্ঞাসা

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা

নলিনী গুপ্ত : সাহিত্যিকা

বঙ্কিমচন্দ্র : বিবিধ প্রবন্ধ

বিশ্বনাথ : সাহিত্যদর্পণ

মনোমোহন ঘোষ : প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা

মোহিতলাল মজুমদার : আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বাংলা কবিতার ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্য, পঞ্চভূত, আধুনিক সাহিত্য, ছন্দ, সাহিত্যের পথে

লালমোহন বিদ্যানিধি : কাব্য-নির্ণয়

শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের ধারা

সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের কথা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩ খণ্ড)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

"সাহিত্য-সন্দর্শন" সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত—

'It is a nice handbook on principles of literary criticism. Bengali is now being seriously studied in colleges and the publication of a book like this is most opportune. The writer has rendered a valuable service to the teacher and taught, as well as to others, who are engaged in literary pursuits. His exposition is precise, clear and agreeable.'

—*The Modern Review.*

'......Must be claimed as a pioneer work in our Bengali Literature. Any progressive literature ought to have a book like this The author has done this marvellously. We unhesitatingly say that it will do immense service to the collegians and to all those who are keen about literature and literary pursuits.'

—*The A. B Patrika.*

'.....With his sound training in Western Criticism and his easy mastery of Bengali Prose style, Mr. Das is ideally equipped for the undertaking. His views are enlightened and well-informed, and his treatment firm in outline and precise. ......Although a pioneer work, it is not tentative and should train our youngmen to careful thinking in matters relating to literature.'

—*Dr. S, N. Ray, M. A. Ph. D.*

'......গ্রন্থখানা অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে। লেখকের আলোচনা যেমন তথ্যবহুল, সুগভীর ও ব্যাপক, তেমনই সত্যকার সমালোচক-সুলভ সূক্ষ্ম অথচ সহৃদয় দৃষ্টি-প্রসূত। গ্রন্থকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন বইখানিতে তাহার পরিচয় আছে। এতদ্ব্যতীত ইংরেজী সমালোচনা-সাহিত্যে ব্যবহৃত বহু শব্দ-সম্পদকে গ্রন্থকার বাংলা প্রতিশব্দে রূপান্তরিত করিয়াছেন। সাহিত্যরসিকগণ ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন।'

—আনন্দবাজার পত্রিকা

'......গ্রন্থখানির অপরিমেয় দান সর্ব্বথা স্বীকৃত হইবে। ললিতকলা, সাহিত্য, কবিতা, নাটক, গল্পসাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর গবেষণামূলক আলোচনা করিয়া যে ভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। পুস্তকখানি পাঠকসমাজে নিঃসন্দেহে সমাদৃত হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাধনার ক্ষেত্রে অনিবার্য্যরূপে সহায়ক হইবে।

—যুগান্তর

'... 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি বিচারের মূলকথাগুলি সাহিত্যরসিক এবং বিশেষ করিয়া ছাত্রছাত্রীদের অবগতির জন্য গ্রন্থটী লিখিত। এইরূপ গ্রন্থ বাংলাভাষায় নূতন, সাহিত্যে এই অতি অতিপ্রয়োজনীয় দিকে দৃষ্টি আশার কথা।'

—প্রবাসী

'......সাহিত্যবিষয়ক বিবিধ আলোচনা ইহাতে সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গীতে করা হইয়াছে।

—শনিবারের চিঠি